কৃষি প্রতিবেশ
ঐতিহ্য, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

সুরাইয়া বেগম

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ

কৃষি প্রতিবেশ
ঐতিহ্য, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

সুরাইয়া বেগম

ROSA
LUXEMBURG
STIFTUNG
SOUTH ASIA

RESEARCH
INITIATIVES
BANGLADESH

কৃষি প্রতিবেশ ঃ ঐতিহ্য, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

Agroecology : Tradition, Present & Future

সুরাইয়া বেগম

Suraya Begum

প্রকাশকাল: ডিসেম্বর, ২০১৮

Published in: December, 2018

প্রকাশনায়
রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব)
বাসা ০৭ (কাজলী), সড়ক ১৭, ব্লক সি
বনানী, ঢাকা-১২১৩, বাংলাদেশ
ফোনঃ (+৮৮০-২) ৯৮২০০৫১-২
Email: rib@citech-bd.com
Website: www.rib-bangladesh.org

Published by
Research Initiatives, Bangladesh (RIB)
House 7 (Kajoli), Road 17, Block C
Banani, Dhaka- 1213, Bangladesh
Phone: (+880-2) 9820051-2
E-mail: rib@citech-bd.com
Website: www.rib-bangladesh.org

সহায়তায়
রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফ্টুং
ফ্রাঞ্জ-মেহ্রিং-প্লাটজ্ ১
১০২৪৩, বার্লিন, জার্মানী
Website: www.rosalux.in
www.rosalux-southasia.org

Supported by
Rosa Luxemburg Stiftung
Franz-Mehring-Platz 1
10243 Berlin, Germany
Website: www.rosalux.in
www.rosalux-southasia.org

মুদ্রণে
ডানা প্রিন্টার্স লিমিটেড
গ-১৬ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১৩

Printed by
Dana Printers Limited
Ga-16 Mohakhali C/A, Dhaka-1213

ছবি: প্রচ্ছদ ও অন্যান্য
সুরাইয়া বেগম
স্থানীয় জাতের বিরুই ধানক্ষেত

Picture: Cover & Inner
Suraiya Begum
Local varity Birui paddy field

Sponsored by the Rosa Luxemburg Stiftung e.V with funds of the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development of the Federal Republic of Germany

মুখবন্ধ

জ্ঞান এবং জ্ঞানের উপর মালিকানা একটি সামাজিক শক্তি। বর্তমান বিশ্বে আধুনিক প্রযুক্তির যে অগ্রগতি সাধন হয়েছে এবং তার বিপরীতে আমাদের কৃষক সমাজ শিক্ষা ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যেভাবে পিছিয়ে আছে তাতে এই জ্ঞান-সম্পর্ক অনেক বেশি অসম হয়ে যাচ্ছে। মানুষকে তার নানাবিধ অধিকার এবং দেশ ও বিশ্ব কিভাবে পরিচালিত হচ্ছে সে সম্বন্ধে সচেতন করাই তার উন্নয়নে সহায়তা করার প্রথম পদক্ষেপ।

রিইব জ্ঞানের এই অসমতা কমিয়ে আনা এবং কৃষকের মাঝে জ্ঞানকে পৌছে দেবার লক্ষ্যে কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকাশনা বাংলায় তৈরী করছে এবং সেসব প্রকাশনা নিয়ে গণগবেষণা দলের মিটিং-এ এবং লোকাল স্কুলে শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কৃষকের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে এবং তার মাধ্যমে জ্ঞানকে প্রসারিত করার চেষ্টা করছে। এ প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে এক ধরনের অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষণ প্রক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে বলা যায়।

'কৃষি প্রতিবেশ' বিষয়টি যখন থেকে মানুষ ভূমি কর্ষণ করা শুরু করেছে তখন থেকেই শুরু। বৈশ্বিক পরিসরে শিল্প বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত এর এক ধরনের ঐতিহ্য ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে প্রযুক্তি যত বেশি প্রসারিত হয়েছে প্রতিবেশ তত বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অন্যদিকে বৈশ্বিক রাজনীতির কারণে বাংলাদেশের মতো দেশগুলো যে ধরনের প্রতিবেশগত ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে এবং এই ক্ষতিগুলো যে কৃষকদের সরাসরি প্রভাবিত করছে তাকে তুলে ধরা এবং এই সংক্রান্ত জ্ঞান কৃষক ও অন্যদের সাথে বিনিময় করা এই বই প্রকাশনার উদ্দেশ্য।

রিইব আরও মনে করে, রাষ্ট্রীয় পরিসরে বিভিন্ন খাতে নীতি নির্ধারক পর্যায়ে যাঁরা কাজ করছেন তাঁদের কাছেও আমাদের এই বক্তব্যগুলো তুলে ধরতে হবে যাতে নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি সুস্থায়ী কৃষি পদ্ধতি প্রণয়ন হতে পারে।

জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা পরস্পর সম্পর্কিত। সেই কারণে শিক্ষার সাথেও কৃষির গভীর সম্পর্ক রয়েছে। পড়ন-পাঠন ও সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় কৃষি ও কৃষক সমাজ যেভাবে বিকশিত হয়েছে তাকে সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারলে একটা সমন্বিত ফলাফল সামনে চলে আসতে পারে, যা বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে বলে আমাদের বিশ্বাস। সেই লক্ষ্যে রিইব-এর এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। এই প্রয়াসে রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফ্‌টুং-এর সহযোগিতা আমাদেরকে সমৃদ্ধ করছে।

শামসুল বারি
চেয়ারম্যান, রিইব।

সূচিপত্র

১. ভূমিকা	৫
২. বাংলাদেশের কৃষি প্রতিবেশ: ঐতিহ্য ও বর্তমান	৮
৩. কবিতায় ও খনার বচনে বাংলার গ্রাম, কৃষি ও ঐতিহ্য	১৭
৪. কৃষি প্রতিবেশ : বৈশ্বিক রাজনীতি ও দূষণ	২৮
৫. নারী ও প্রতিবেশ	৩৯
৬. কী করণীয় এবং কী করছি	৪২
৭. ভবিষ্যৎ ভাবনা ও উপসংহার	৪৮
তথ্যসূত্র	৫৪

গ্রাম বাংলার কৃষি প্রতিবেশ

১. ভূমিকা

এই পৃথিবী আমাদের কাছে সুন্দর, বিপুল, চিরন্তন ও উপভোগ্য। সবুজ বিস্তীর্ণ ফসলের মাঠ, বৈচিত্র্যময় সবজীর ক্ষেত, সুগভীর বন, সুউচ্চ পাহাড়, প্রবাহিত নদ-নদী, খাল-বিল, বিশাল সমুদ্র ও তার ঢেউ ভেঙে নিরন্তর তীরে আছড়ে পড়ার সৌন্দর্য, বায়ুমন্ডল, উন্মুক্ত নীলাকাশ, উজ্জ্বল সূর্য এবং মনোরম চাঁদ সব আমরা পেয়েছি প্রকৃতি থেকে, অনায়াসে, বিনামূল্যে, শ্রম এবং সাধনা ছাড়াই - প্রকৃতির উপহার হিসেবে। যাকে অর্থ দিয়ে কেনা অন্য সব কিছুর মত শুধু ভোগ করার নয়। উপহারকে মনে নিতে হয় বুদ্ধি ও সৃজনশীলতায়, গ্রহণ করতে হয় সযত্নে। আর এভাবেই উপহারকে যথাযথ সম্মান দেখানো হয়ে থাকে। প্রকৃতি আমাদের যে উপহার দিয়েছে তার ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। প্রকৃতির এই যে উপহার তাকে

আমরা আজ কীভাবে আদরে-সযত্নে রেখেছি, প্রকৃতি বাংলাদেশকে কী দিয়েছিল, এখন তার রূপ কি এবং কীভাবে একে তার স্বরূপে, সুস্থায়ীভাবে টিকিয়ে রাখা যায় তা এই বইয়ের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ।

প্রতিবেশ, জীববৈচিত্র্য, পরিবেশ শব্দগুলো প্রায় সমার্থক এবং পরস্পর সম্পর্কিত, যার কেন্দ্রে রয়েছে মানব প্রজাতির দৃষ্টিভঙ্গী । মানুষ কীভাবে একে দেখছে এবং কীভাবে একে ব্যবহার করছে এবং কীভাবে নিয়ামকের ভূমিকায় কাজ করছে । মানব প্রজাতির অংশ হিসেবে, বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন কর্মকান্ডের পরিসরে সময় এসেছে এসব নিয়ে ভাববার, কাজ করার । কাজ করাটা জরুরী নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে ।

পৃথিবীর একেবারে আদিতে এখানকার পরিবেশে কেবল জড় উপাদানেরই অস্তিত্ব ছিল । তখন পৃথিবীতে না ছিল কোন জীব না কোন সামাজিক উপাদান । ক্রমে ক্রমে পৃথিবীতে জৈব উপাদানের উদ্ভব ঘটেছে । ক্রমবিকাশের ধারায় এসেছে শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ ।

পরিবেশের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এর নানা উপাদানের মধ্যে এক ধরনের সুক্ষ, জটিল এবং পরস্পর নির্ভর ভারসাম্য রয়েছে । আমাদের চারপাশে যে চারটি ভৌত উপাদান - বাতাস,পানি, মাটি ও সৌরকিরণ - তাদের মধ্যে দীর্ঘকালের ক্রিয়ায় পরিবেশের নানা উপাদানের মধ্যে এই পারস্পরিক ভারসাম্য গড়ে উঠেছে । তবে প্রকৃতির উপর অন্যসব প্রাণীর চেয়ে সবচেয়ে বেশি প্রভাব রেখেছে মানুষ । প্রাণীদের মধ্যে মানুষই বেশি বুদ্ধিমান, তাই সে চারপাশের প্রকৃতিকে সবচেয়ে বেশি কাজে লাগিয়েছে ।[১]

চারপাশের পরিবেশকে নিজের পছন্দমত বদলাবার জন্য মানুষ প্রযুক্তির উদ্ভব ঘটিয়েছে । তাতে প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার তার জন্য আরও সহজ হয়েছে । বিস্তীর্ণ এলাকাকে সমান করে চাষাবাদের মাধ্যমে ফসল ফলাতে শুরু করেছে । বন জঙ্গল কেটে সৃষ্টি করেছে গ্রাম, নগর, পাহাড় কেটে বের করেছে পথ, সৃষ্টি করেছে বিশাল সব জলাধার আর বাঁধ, নানা ধরনের নতুন নতুন উদ্ভিদ আর প্রাণী । মানুষের এই নির্মাণ রয়েছে অব্যাহত । আবিস্কার করেছে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যাদি, যা ক্ষেত খামারে, চাষাবাদে ব্যবহার করছে । এসবের মধ্যে দিয়ে মানুষের জীবনে এসেছে স্বাচ্ছন্দ্য আর প্রাচুর্য । আঠারো শতকের শেষে শিল্প বিপ্লব এসে আরও সহায়তা করেছে । এসবের মধ্য দিয়ে প্রাণী হিসেবে মানুষ তার শ্রেষ্ঠত্বের প্রকাশ ঘটিয়েছে । এর ফলশ্রুতিতে ক্রমশ মানুষের সংখ্যা বেড়েছে । এই সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে পেতে এমন অবস্থায় এসে দাড়িয়েছে যে এর প্রভাবে দীর্ঘদিন ধরে গড়ে ওঠা প্রকৃতির সুষম পরস্পর নির্ভর ভারসাম্যে বিপর্যয় ঘটতে আরম্ভ করেছে ।

পৃথিবীর সবকিছু অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ওজোন স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত পরিমন্ডলের আলো, বাতাস, পানি, মাটি, বন, পাহাড়, নদ-নদী, উদ্ভিদ, জীব জগত, মানুষ অর্থাৎ জড় ও জীবের সমন্বয়ে যা সৃষ্টি তাই প্রতিবেশ । প্রতিবেশে মানবজাতির বাইরে অন্যান্য বিষয়গুলোর অস্তিত্বকে কখনও নৈতিকভাবে মূল্যায়ন করা হয়নি । Aldo Leopold ভূমি সম্পর্কীয় আলোচনায় সর্বপ্রথম এ বিষয়ে আলোকপাত করেন ।[২] তাঁর মতবাদ ছিল প্রজাতিবাদ বিরোধী । প্রজাতিবাদ এবং মানবকেন্দ্রিক মতবাদ একই মতে বিশ্বাসী । প্রজাতিবাদ প্রজাতির শ্রেষ্ঠতায় এবং মানবকেন্দ্রিক মতবাদ মানব প্রজাতির শ্রেষ্ঠতায় বিশ্বাসী এবং এরা পরিবেশকে তাদের সহায়ক সত্তা হিসেবে মনে করে । পরিবেশের যে নিজস্ব মূল্য এবং সত্তা আছে তারা এটা স্বীকার করতে

চায় না। মানব প্রজাতির শ্রেষ্ঠতায় বিশ্বাসীরা মনে করে, প্রকৃতি মানব প্রজাতির জন্যই সৃষ্ট। আর সে কারণেই প্রকৃতির প্রতি মানুষ সহিংস আচরণ করে। মানুষ মনুষ্যত্বকে অধিক গুরুত্ব দেয় এবং নিজেকে উচ্চস্তরের মনে করে। প্রকৃতির এই গুণ নেই বলে প্রকৃতি নিম্নস্তরের। এই যে শ্রেষ্ঠত্বের বোধ, একে অনুধাবনে পরিবেশবাদের সৃষ্টি হয়। পরিবেশ সম্পর্কে নৈতিক বোধকে নিয়েই গড়ে উঠেছে পরিবেশবাদ। পরিবেশকে, সমাজে বিদ্যমান মূল্যবোধ সংকীর্ণ দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করেছে এবং পরিবেশের যে নিজস্ব মূল্য আছে তাকে অস্বীকার করেছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের এই বোধ প্রকৃতিকে যেমন তেমনি নারীর শ্রেষ্ঠত্ব বা মূল্যকেও উপেক্ষা করেছে।

লিওপোল্ড-এর তত্ত্বকে আরেকটু এগিয়ে নিয়ে দার্শনিক পল টেলর[৩] মনে করেন যে, পরিবেশে প্রতিটি সত্ত্বা গুরুত্বপূর্ণ, তা মানব সত্তা বা মানবের বাইরে, যে কোন সত্তা। এ প্রসঙ্গে তিনি "প্রকৃতির প্রতি সম্মান"-কে একটা নীতি হিসেবে ব্যাখা করেছেন। তিনি বলেছেন, প্রকৃতির প্রতি আমাদের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকতে হবে, যা অন্য অর্থে প্রকৃতির প্রতি সম্মান। বিপন্ন প্রজাতির সংরক্ষণ, পরিবেশ দূষণরোধ করা মানব সমাজের কর্তব্য। প্রকৃতির প্রতি সম্মান এই দৃষ্টিভঙ্গীর সমান্তরাল হচ্ছে মানুষের প্রতি সম্মান। প্রকৃতির প্রতি যদি মানুষের এই সম্মানবোধ না থাকে তাহলে আমরা অনায়াসেই বন কেটে উজাড় করে ফেলব, পথ চলতে ঘাসফুল, উদ্ভিদকে পায়ের তলায় চেপে নির্বিবাদে হেঁটে চলে যাব, হার্বিসাইড বা আগাছানাশক দিয়ে সঙ্গী উদ্ভিদ, অশস্য উদ্ভিদ নাশ করব। আর এসবের মাধ্যমে প্রকৃতিকে মানব জীবনের বৈরী করে তুলব। এসব বিষয়গুলো এখন আমাদের সবার ভাবনার জগতে নিয়ে আসতে হবে এবং সেভাবে কাজ করতে হবে।

বৃক্ষ আমাদের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার সহসঙ্গী

২. বাংলাদেশের কৃষি প্রতিবেশ: ঐতিহ্য ও বর্তমান

কৃষি প্রতিবেশ ধারণা

কৃষিকাজ ও ভূমি ব্যবহারের প্রেক্ষাপটে, জীব জগতের (মানুষ, অন্যান্য প্রাণী ও গাছপালা) সাথে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের (যেমন: মাটি, পানি, বায়ু, নদী, পাহাড়, গাছ-পালা, পশু পাখী প্রভৃতি) যে পারস্পরিক সম্পর্ক সেটা নিয়ে অধ্যয়নই হচ্ছে কৃষি প্রতিবেশ বা এগ্রোইকোলজি ।

এগ্রোইকোলজি এমন কতগুলো চর্চা বা কাজের সমষ্টি যার মাধ্যমে কৃষিকাজকে স্থানীয় পর্যায়ে টেকসই ও মজবুত করে। এর লক্ষ্য হল পুষ্টিসমৃদ্ধ ও রাসায়নিকমুক্ত ফসল ফলানো। এ ধরনের কৃষিকাজ ইকোসিস্টেমকে সুসংহত ও পুনরুদ্ধার করে এবং বাইরের উপাদান যেমনঃ রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে দেয়। এসব উপাদান তৈরিতে অনেক শক্তি খরচ হয়, খনিজ সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার হয় এবং ক্ষতিকর গ্যাস বাতাসে ছড়ায়। এছাড়া এসব উপাদান মানব স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য খুবই ক্ষতিকর। অন্যদিকে এগ্রোইকোলজি হল কৃষিখামারের নিজস্ব সম্পদ এবং স্থানীয়ভাবে পাওয়া গাছ, পাখি, প্রাণী, পোকা এবং অনুজীব এর যথাযথ ও সুষ্ঠু ব্যবহার করা, যেখানে এসবের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা সম্পর্ক বজায় থাকে। এই চাষ পদ্ধতি মাটির উপরের ও নীচের ভূমি ও পরিবেশ উভয়ই রক্ষার উপর গুরুত্ব দেয়।

অতিরিক্ত বালাই, কৃষিপণ্যের উচ্চমূল্য, শস্যহানি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মাধ্যমে পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে এগ্রোইকোলজি ভালভাবে খাপ খায়, যেখানে ভূমি, মাটি ও ফসল উৎপাদনে সহায়ক এবং বছরের পর বছর তা অব্যাহত থাকে। এগ্রোইকোলজি খাদ্যসার্বভৌমত্ব ও খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কিত মানুষের অধিকারকে প্রাধান্য দেয় যা বেঁচে থাকার জন্য অত্যাবশ্যক।[৪]

কৃষি প্রতিবেশের ঐতিহ্য

বাংলাদেশ ভৌগোলিকভাবে একটি পলিসমৃদ্ধ বদ্বীপ। পলিমাটির ফলে এই দেশে ফসল চাষ করা কষ্টসাধ্য নয়। আমাদের দেশের কৃষির রয়েছে সমৃদ্ধ ইতিহাস এবং ঐতিহ্য। যে কারণে বাংলাদেশ সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বাংলাদেশ নামে পরিচিত ছিল। ঐতিহ্যকে না জানলে বর্তমানের কৃষিকে অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

সত্তর দশকের আগ পর্যন্ত বাংলাদেশের কৃষি প্রায় পুরোপুরিই প্রাকৃতিক কৃষি ছিল। কেমন ছিল বাংলার কৃষির উপকরণ এবং কৃষি-প্রতিবেশ তার বর্ণনা পাওয়া যায় বিভিন্ন গবেষকের লেখনীতে এবং গবেষণা গ্রন্থে। যেখানে বাংলাদেশের অন্যতম ফসল ধান-এর চাষ, এর ইকোসিস্টেম ও জীববৈচিত্র্য, সার, সেচ এবং ফলন সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। বাংলাপিডিয়াতে এ সম্পর্কে একটা ধারাবাহিক তথ্যসমৃদ্ধ বর্ণনা করা হয়েছে। যা কিনা কৃষি-প্রতিবেশ এর বিবর্তন বুঝতে সহায়তা করবে। এখানে তার কিছু অংশ তুলে ধরা হল।[৫]

প্রাচীনকাল থেকেই কৃষি বাঙালীর জীবিকার উৎস কারণ প্রায় সমগ্র বাংলায় পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতসহ তিনটি প্রধান নদী- পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা এবং তাদের অসংখ্য শাখা-প্রশাখা দ্বারা প্রসারিত হবার কারণে পলিসমৃদ্ধ সমভূমি এখানে কৃষিকাজকে সহজ করে দিয়েছিল। কৃষিখাতে প্রথম থেকেই অধিকতর জনসংখ্যা সম্পৃক্ত ছিল। বিশেষ করে সুতিবস্ত্র উৎপাদন হ্রাসের ফলে এর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায়। প্রাচীন, মধ্যযুগ ও বৃটিশ আমলে শস্য উৎপাদনই ছিল কৃষির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপখাত। অন্য তিনটি উপখাত- পশুসম্পদ, মৎস্য এবং বন ছিল অপেক্ষাকৃত গুরুত্বহীন। ফসল আহরণের সময় ছিল ভাদই (শারদ), খরিফ (হৈমন্তী) ও রবি (বাসন্তী)। ফসলের মধ্যে ছিল ধান, পাট, গম, জোয়ার, যব, আখ, তামাক, তৈলবীজ, আলু, পিঁয়াজ, রসুন, আফিম, নীল, চা, বিভিন্ন ধরনের শাকসবজী, ডাল, সুগন্ধি ও মসলা।

ধান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাচীনতম শস্যগুলির একটি। মহাস্থান ব্রাহ্মী শিলালিপিতে খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতকে ধানের সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া তুলা ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক ফসল। এসব ছাড়াও বহু শাকসবজি ও ফলমূল উৎপন্ন হতো। খনার বচনেও যার উল্লেখ পাওয়া যায়। এমন অনেক গাছের প্রাচুর্য্য ছিল যা এখন কম দেখা যায়। যেমন মহুয়া, ডুমুর এর মত গাছ। অন্যদিকে রামচরিত গ্রন্থে বরেন্দ্রকে অশোক, কেশর, মহুয়া, কনক, কেতকী, মালতী, নাগকেশর ও পদ্মসহ অসংখ্য জাতের আকর্ষণীয় ফুলের স্থান হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। ভেষজ ফলবৃক্ষ যেমন আমলকি, বহেড়া এবং হরিতকী- এই ত্রিফলা প্রাচীন বাংলায় রোপণ করা হতো।

বিভিন্ন ছাপচিত্র ও লেখা থেকে প্রাচীন বাংলার ভূমির উর্বরতার প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়। হিউয়েন সাং জমিতে নিবিড় ও নিয়মিত চাষাবাদ লক্ষ্য করেন। অবশ্য সকল জমি উর্বর ছিল না এবং সেগুলি পর্যাপ্ত বৃষ্টির পানিও পেত না, তাই সেসব জমিতে কৃত্রিমভাবে সেচ দেওয়া হত। তাই বিভিন্ন শাসকগণ মহিপাল, রামসাগর, নীলসাগর, প্রাণসাগরসহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য জলাশয় সম্ভবত এজন্যই খনন করেছিলেন। ভূগর্ভস্থ জল প্রবাহের নাগাল পাওয়ার জন্য কুপ খনন কৌশলও লোকে জানত এবং নালায় বা খালে পানি সরবরাহের জন্য কখনও কখনও তারা নদীর গতিপথ পরিবর্তন করত। অনেক সময় খালগুলিতে পানি উপচিয়ে ধানক্ষেতে পানি সেচের কৌশল তারা করেছিল। উইলিয়াম উইলক্স এই প্রাচীন পদ্ধতিকে বলেছেন “উপচে-পড়া সেচ” (overflow irrigation)।

সেসময় যেসব কৃষি উপকরণ ব্যবহার করা হতো তার মধ্যে কাস্তে, লাঙলের হাল, দা, পাশি, পাচনবাড়ি ও ঢেকি অন্যতম ছিল। গ্রাম্য কামার ও কাঠমিস্ত্রীরাই এসব হাতিয়ারের অধিকাংশ তৈরি করত। মধ্যযুগে বাংলায় আগত বিদেশী পর্যটকগণ বাংলার মাটির উর্বরতা ও কৃষির অগ্রগতির উচ্চ প্রশংসা করেছেন। ১৩৪৯- ৫০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে ইবনে বতুতা পূর্ব বাংলা সফর করেন। তিনি নদী পথে ১৫ দিন ধরে সিলেট থেকে সোনারগা পর্যন্ত ভ্রমণকালে ডানে ও বামে ফলবাগান, উন্নত পানি সেচ ব্যবস্থা, সমৃদ্ধ গ্রাম ও বাগান দেখতে পান। তাঁর ভাষায় “যেন আমরা একটি বাজারের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলছি।” শায়েস্তা খাঁর সময়ে বার্নিয়ার (Bernier) বাংলায় এসেছিলেন। তিনি পদ্মার উত্তর তীরে বিভিন্ন যান্ত্রিক পানিসেচসহ ফসলের উর্বর মাঠ দেখতে পেয়েছিলেন। মোগল ইতিহাসবিদ আবুল ফজলের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, “ফসলের সামান্য ক্ষতি ছাড়াই একটি বিশেষ জাতের ধান একই বছরে তিনবার রোপন ও কাটা হতো।” সুলতানি ও মোগল আমলে বাংলার কৃষির যথেষ্ট বিকাশ ঘটেছিল। এই সময় অধিক উর্বর জমি চাষাধীনে আনার জন্য শস্যের ফলন হার বৃদ্ধি পেয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। জমি-মানুষ অনুপাত অনুকূল থাকায় স্বল্প-নিবিড় চাষাবাদ অনুসরণ করা হতো। মধ্যযুগের বাংলায় মাথাপিছু উৎপাদন অপেক্ষাকৃত অধিক ছিল।

ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসন আমলে তৎকালীন ভারতীয় উপমহাদেশের কৃষিখাতের উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ ঘটে। যদিও আঠারো শতকের শেষের দিকে বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে আবাদযোগ্য পতিত জমি ছিল। যেসব পরে আবাদের আওতায় আনা হয়। ২৪ পরগনা, খুলনা ও বাকেরগঞ্জ- এই তিন জেলার কৃষক সুন্দরবন অঞ্চলে চাষাবাদের চেষ্টা করে। এর ফলে এসব এলাকায় চাষাবাদ সম্প্রসারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে বেশি ছিল। তবে সরকারি পর্যায় থেকে এ ধরনের তথ্য সরবরাহের শুরু হয় ১৮৯১/৯২ সালের সময় থেকে। যেমন Estimate of Area and Yields of Principle Crops of India; Agricultural

Statistics of Bengal; Season and Crop Report ইত্যাদি । এইসব রিপোর্টে দেখা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় পূর্ববঙ্গের জেলাগুলোতে আবাদি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল ।

১৮৮৫ সালে একটি প্রাদেশিক কৃষি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সংস্থাটি কৃষি উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে । এ সময় বাণিজ্যিক সারের ব্যবহার কৃষকেরা জানত না, মাত্র ৬% ধানী জমিতে উন্নত জাতের বীজ বপন করা হত । ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পর কৃষি উৎপাদন পরিমাণ ও মূল্যের দিক দিয়ে যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি কৃষি অনেক বেশি বাণিজ্যিক বা বাজারমুখী হয়েছিল । বিক্রয়ের জন্য উৎপাদন শুধু অর্থকরী ফসলের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকেনি । Report of the Marketing of Rice in India-র পরিসংখ্যান অনুযায়ী উনিশ শতকের ত্রিশের দশকের শেষের দিকে বাংলায় উৎপাদিত মোট ধানের শতকরা ৪৪ ভাগ বাজারজাত হত । এসময় অর্থকরী ফসল হিসেবে পাটের আবাদ বৃদ্ধি পায় । উনিশ ও বিশ শতকে অর্থকরী ফসল হিসেবে পাট বাদেও ছিল চা, আফিম, নীল, তামাক ও বিভিন্ন ধরনের তৈলবীজ । ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর জবরদস্তিমূলক নীল চাষ কৃষকদের কাছে কাঙ্ক্ষিত ছিল না, ফলে নীলবিদ্রোহ দেখা দেয় । ফলে সেখানে ইক্ষু চাষের প্রবণতা বৃদ্ধি পায় ।

১৯৪৭ এ পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর ১৯৫০ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলোপ করা হয় এবং সেখানে জমিতে কৃষকের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় । সেই সাথে ষাটের দশকের মাঝামাঝি পাকিস্তান সরকার বীজ-পানি-সার প্রযুক্তি গ্রহণের মাধ্যমে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য একটি কর্মসূচী শুরু করে । ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সৃষ্টি হবার পর পাকিস্তান আমলে প্রতিষ্ঠিত (পূর্ব পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনকে সেচ পাম্প, সার ও উন্নত জাতের বীজ সংগ্রহ ও বন্টনের দায়িত্ব দেওয়া হয় । এতে ধানের ক্ষেত-এর বৃদ্ধি ঘটে । এই সময়ে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে ঋণ দান শুরু করে । এত কিছু করেও ১৯৬৭/৭০- ১৯৮৫/৮৮ সময়ে সামগ্রিক শস্যের পরিমাণ ১.৫৩% এবং খাদ্য শস্যের পরিমাণ ১.৮৯% বৃদ্ধি পেয়েছিল । যেখানে জন্মহার ছিল ২.৪৮ শতাংশ । এর মধ্যে ধানের উৎপাদন ছিল মাত্র ১.৯৬% । ১৯৯৭-৯৮ সাল পর্যন্ত ধানের উৎপাদন প্রায় একই পর্যায়ে ছিল (১ কোটি ৮০ লক্ষ টন) ।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ভূমির খন্ডীকরণ এবং ভূমির বাণিজ্যিক ব্যবহারের কারণে শস্য উৎপাদন হয় এমন জমি ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে । এ কারণে ক্ষুদ্র আকারের খামারের গড় আয়তনও হ্রাস পাচ্ছে । এই খামারগুলোও টেকসই হতে পারছে না কৃষকের দারিদ্র্যের কারণে । ১৯৯৯ সালের কৃষি নীতির মাধ্যমে জমির সিলিং ২৫ বিঘা করার কারণে সরকার সর্বোচ্চ সীমার অধিক জমি অধিগ্রহণ করলেও (যা অত্যন্ত কঠিন কাজ) এভাবে পাওয়া ভূমি খামারগুলোতে বন্টন করে ভূমি সংস্কার করার বিষয়টি গুরুত্বহীন হয়ে পড়বে । এখানেই সমস্যার কেন্দ্রীয় জটিলতা নিহিত যার মুখোমুখি কৃষি অর্থনীতি ।

কৃষি-জীববৈচিত্র্য

শত শত বছর যাবৎ বাংলাদেশের মানুষ প্রায় ৮৫ ধরনের কাজে ১,৩৬৪ প্রজাতির দেশি-বিদেশি উদ্ভিদ চাষ, সংরক্ষণ ও ব্যবহার করে আসছে । এদেশে প্রায় ১৭৫ প্রজাতির ভেষজ উদ্ভিদ জন্মাতো । প্রায় ১০

হাজার বছর ধরে এই অঞ্চলের বাসিন্দারা বিভিন্ন শস্য এবং উদ্ভিদ নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী উৎপাদন করত । এমনকি বিভিন্ন পরিবারে ভেষজবিদ্যার চর্চাও ছিল ।

ধানের জীববৈচিত্র্য ছিল অত্যাধিক । এদেশে ধানের প্রায় ১০ হাজার প্রকারভেদ ছিল । যার মধ্যে ৬৩টি ভ্যারাইটি, ১৮টি শংকর করা এবং বাকী সবগুলি অবিমিশ্র ধারার জাত । সুন্দরবন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় ধানের তিনটি বনজ প্রজাতি শনাক্ত করা গেছে । গোপালগঞ্জ ও সিলেটের নিম্ন-ভূমি এলাকা গভীর পানির ধানের জাতগুলির আদি উৎস বলা হয় । আর্থিক বিবেচনায় "উচ্চফলনশীল" জাত প্রবর্তনের ফলে ধানের অনেক আদি জাত বিলুপ্ত হয়ে গেছে ।

বাংলাদেশের গ্রামগুলোতে কৃষি প্রতিবেশ ও কৃষি কেমন ছিল সে সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষক এক সময়ে "গ্রাম স্টাডি" এই থিমে নৃতাত্ত্বিক কাজ করেছিলেন এবং তাদের লেখায় বিধৃত হয়েছে বাংলার কৃষক ও কৃষি নিয়ে । যেখানে ফুঠে উঠেছে বাংলার কৃষি, কৃষক সমাজ, গ্রামীণ জনজীবন, চাষাবাদ, সমাজ কাঠামো, যার মাধ্যমে আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয় সে সময়কার কৃষি প্রতিবেশ । এখানে তার কিছু বর্ণনা তুলে ধরা হলো ।

রামকৃষ্ণ মুখার্জী বগুড়া জেলার ৬টি গ্রাম নিয়ে গবেষণা করে লিখেছেন "Six Villages of Bengal" নামক বই । সেখানে তিনি দেখিয়েছেন যে, একসময় গ্রামগুলো স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম ছিল, কিন্তু ক্রমশ: তা পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে । এক্ষেত্রে স্থানীয় হাটশহর এলাকার গ্রামীণ জীবন বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, "হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকজন এখানে বসবাস করে । নানা বর্ণের হিন্দু লোকজন বসবাস করলেও গ্রামটিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ এলাকা হিসেবে গড়ে তুলতে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ বর্ণের লোকজনের প্রয়োজন, আজকাল আর এমনটি দেখা যায় না । গ্রামটির সমাজ কাঠামো দুর্বল হয়ে যাচ্ছে এবং অনেকে কাজের অন্বেষণে গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছে ।"[৬]

আগে গ্রামে জনগোষ্ঠীর বসবাসের জন্য কুড়েঘর ছিল প্রধান । ঘরের দেয়ালগুলো মাটি দিয়ে লেপা ছিল । গ্রামে বাসস্থানের চারপাশে বাগান, বাঁশঝাড়, বিক্ষিপ্ত গাছ গাছড়া এবং কিছু সংখ্যক পুকুর ও ডোবা আছে । গ্রামে কামার, কুমোর, জেলে, তাঁতী, কলু, মুচি, মেথরসহ পুরোহিত, জমিদার এবং বৃহত্তর জমির মালিক বসবাস করত এবং এই স্বয়ংসম্পূর্ণতা তৈরি করা হতো । মুখার্জী লিখেছেন যে, গ্রামটিকে স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে গড়ে তোলার জন্য ব্রাহ্মণ জমিদারগণ অন্যান্য বর্ণের কিছু পরিবারকে তাদের গ্রামে নিয়ে আসে ও স্থায়ীভাবে বসবাস করতে প্রণোদনা দেয় । জমিদাররা দু'টি হাট বসায় অর্থনীতিকে সচল করার জন্য ।

সমাজের মধ্যে ভাত গ্রামবাসীদের প্রধান খাদ্য এবং ধানই তাদের প্রধান উৎপন্ন ফসল । অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য যেমন গম, বার্লি এবং ভূট্টা গ্রামবাসীরা খায় না । গ্রামের লোকদের কাছে ডাল খুব প্রিয় খাবার নয় কিন্তু তারপরেও এলাকায় ছোলা এবং কালাই লাগানো হয় । মাছ-মাংস গ্রামবাসীদের প্রিয় কিন্তু কেনার সামর্থ্য নেই । ফলে গ্রামবাসীরা মাংস খুব কম খায় । ছাগল, ভেড়া পোষে কিন্তু তা শুধু বাজারে বিক্রির জন্য । রান্নায় তেল কম ব্যবহার করা হয় এবং সাধারণত সরিষার তেল ব্যবহার করা হয় ।[৭]

১৯৪২ সালের চিকিৎসকদের তথ্যানুযায়ী গ্রামে যেসব অসুখ প্রধান ছিল এবং যেসব অসুখ মৃত্যুর কারণ ছিল তার মধ্যে ম্যালেরিয়া, আমাশয়, টাইফয়েড, নিউমোনিয়া, বাতরোগজনিত পক্ষাঘাত, যক্ষা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । এসব অসুখের সাথে স্যানিটারি ব্যবস্থার সমস্যা প্রধান কারণ ছিল ।[৮]

গ্রামের কৃষকরা যেসব বীজ ব্যবহার করত সেগুলো আগের বছরের ফসল থেকে সংগৃহিত। কৃষকরা সাধারণত ৫-৭ বছর পর পর নিজেদের মধ্যে বীজ বিনিময় করত। তবে সঠিক বীজ নির্বাচনের ক্ষেত্রে তারা তেমন সচেতন ছিল না। প্রত্যন্ত গ্রামগুলোর কৃষকরা জানত না যে, সরকারি কৃষি খামারে বীজ পাওয়া যায়। একটা গ্রাম সিলিমপুরের কৃষকরা জানত এবং তারা ১৯৩৬ সালে সরকারি বীজ ব্যবহারও করেছিল, কিন্তু আশানুরূপ ফলন হয়নি বিধায় তারা তা ব্যবহার পরিত্যাগ করেছে। এছাড়া সকল কৃষককে সরকারি বীজ সরবরাহ করা যেত না কারণ এসব বীজের দাম বেশি ছিল যা কৃষকের ক্রয় করার ক্ষমতার বাইরে। তাই তারা নিজেদের মধ্যে বীজ বিনিময়ই অব্যাহত রাখত।

ধানচাষের জন্যে সার হিসেবে গোবর ও পুকুরের তলদেশ থেকে তোলা কালো পলিমাটি ব্যবহার করা হত। এক একর ধানের জমিতে প্রয়োজনীয় সারের পরিমাণ ছিল ষোলো গাড়ি কালোমাটি এবং চার গাড়ি গোবর সার যদি দুটিই ব্যবহার করা হয়। শুধু গোবর সার হলে ৬ গাড়ি যথেষ্ট। যদি কোন খানায় এক জোড়া বলদ, একটি গাভী এবং একটি বাছুর থাকে তাহলে তা থেকে ৩০ গাড়ি গোবর সার পাওয়া সম্ভব, যা দিয়ে ৫-৬ একর জমি চাষ করা যেত অনায়াসেই। তবে পাট ও রবিশস্যে আরও বেশি গোবরের প্রয়োজন হয়।[৯] কৃষক সাধারণত: যা করত সার হিসেবে ব্যবহার্য গোবরের মান বজায় রাখতে পারত না সঠিক উপায়ে সংরক্ষণের অভাবে।[১০]

গ্রামগুলোতে আমন ধানই ছিল প্রধান ফসল এবং প্রায় ৩০ জাতের আমন ধানের চাষ করা হয়।[১১] গ্রামগুলোতে দুটি কারণে পর্যায়ক্রমে শস্য আবাদের রীতি গড়ে উঠেছে। প্রথমত: একই জমিতে বছরের পর বছর একই শস্য চাষ করলে উক্ত জমিতে সেই শস্যের বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় উর্বরতা হ্রাস পায়। দ্বিতীয়ত: কৃষকরা একাধিক ফসলের জন্য তাদের জমিজমার একটি অংশ কাজে লাগাতে পারে এবং এর ফলে তার কম জমিজমা থেকে বেশি মুনাফা পায়। পর্যায়ক্রমে শস্য চাষের জন্য তারা উঁচু জমিগুলোকেই বেশিরভাগ কাজে লাগিয়ে থাকে।[১২] তবে ধানের জমিকে কদাচিত ব্যবহার করা হত। রামকৃষ্ণ মুখার্জীর লেখা থেকে তৎকালীন স্বশাসিত গ্রামের কৃষি বিষয়ক একটা চিত্র আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়।

ভেলাম ভান সেন্ডেল সম্পাদিত "দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় ফ্রান্সিস বুখানন: কুমিল্লা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রামে তার ভ্রমণ" শীর্ষক বইতে দেখা যাচ্ছে যে, ফ্রান্সিস বুখানন ১৭৯৮ সালে বৃটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির চাকুরে হিসেবে লাভজনকভাবে মসলা চাষ সম্ভব কিনা তার অনুসন্ধানে বাংলার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। এই ভ্রমণের সময় তৎকালীন বাংলার কৃষি সম্পর্কে তাঁর পর্যবেক্ষণ এবং বর্ণনা ছিল ডিটেইল এবং উল্লেখযোগ্য। ভ্রমণের মাধ্যমে তিনি দেখেছেন, বাংলার চাষাবাদ সম্পর্কে জেনেছেন এবং এ বিষয়ে লিখেছেন এভাবে - "লাঙল দিয়ে কৃষি জমিতে হালচাষ শুরু হয় ফেব্রুয়ারি মাসে। এপ্রিল এবং মে মাসে প্রথম শস্য আউশ ধানের চারা রোপণ করা হয় এবং জুলাই বা আগস্ট মাসের শেষে সেই ধান পাকে। এর পর পরই আমন ধানের চারা রোপণ করা হয়। এটা হল বাঙালির আমন ধান যাকে লোকেরা হৈমন্তিক ধান বলে। আউশ ধান নৈমিত্তিক প্রয়োজনে ব্যবহার হয়, আমন ধান ভালোভাবে সংরক্ষণ করা হয় এবং এই অঞ্চল থেকে প্রচুর পরিমাণে তা চালান দেওয়া হয়। অধিকাংশ মানুষ শীতকালে তাদের জমি খালি রাখে, তবে অনেকে শীতকালীন সময়ে তাদের জমিতে রবিশস্য যেমন ডাল বা মাসকালাই চাষ করে।"[১৩]

বুখানন আরও লিখেছেন, "চাষীদের বাড়ির পাশের পুকুর ধারের উঁচু জমি বেশি মূল্য পায়, এখানে বিভিন্ন সবজী চাষ হয় এবং সার হিসেবে এতে ছাই ছিটানো হয়।" তিনি প্রশংসা করেছেন চাষীদের যে তারা জমির যত্ন করে, জমি পরিষ্কার রাখে। তিনি আরও বলেছেন যে, "এর চেয়ে সুন্দর দেশ আর হয় না। মাঠ শস্য সম্ভারে পরিপূর্ণ, গ্রামের ঘর বাড়ি ছায়াঢাকা, বৃক্ষশোভিত। সবই জানান দিয়ে চলেছে প্রকৃতির ঐশ্বর্য ও বিভা।"[১৪]

পিটার বার্টোসি ১৯৭০ সালে কুমিল্লা শহর থেকে চার মাইল দূরের কোতোয়ালী থানার কয়েকটি গ্রামে গবেষণা করেছেন এবং লিখেছেন "অস্পষ্ট গ্রাম : পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামীণ সামাজিক কাঠামো এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক সংকলন" শীর্ষক গবেষণা গ্রন্থ। গ্রাম এলাকার বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন - "মৌসুমী বায়ুর খেয়াল খুশীর উপর নির্ভরশীল ধান চাষই হচ্ছে অর্থনীতির মূল ভিত্তি। ফসলী জমির শতকরা ৯০ ভাগ এলাকা ধানের সাথে আখ, শাক-সবজী, ডাল ও মসলা উৎপাদন করে থাকে। কৃষকগণ মৌসুমে ধান চাষাবাদের জন্য উপযোগী ব্রহ্মপুত্র নদী বাহিত উর্বর পলিমাটি আটকিয়ে রাখে। মৌসুমী বায়ুর উপর কৃষকদের নির্ভরতা এ ধরনের কৃষি পদ্ধতির দুর্বল দিক। বছরের প্রথম ফসলের (আউশ ধান) বীজ বপন করা হয় বসন্ত আগমনের সাথে সাথে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই যেন জুলাই এর মাঝামাঝি সময়ে ফসল তোলা যায়। আউশ ওঠার সাথে সাথে জমিতে আমন ধান চাষ করা হয় যাতে ডিসেম্বরে ধান ওঠে। আধুনিক প্রযুক্তির পূর্বে মধ্যবর্তী শুষ্ক মৌসুমে তৃতীয় ফসল হিসেবে নদী, নালা, খাল, বিল ও পুকুরের পাশের জমিতে বোরো চাষ করা হয়।"[১৫]

বার্টোসির পর্যবেক্ষণে একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক উঠে আসে যা বর্তমানের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। তিনি লিখেছেন: "এই বিশাল জনসংখ্যাকে খাওয়ানোর জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য উৎপাদনের প্রয়োজন। পরিবেশগত প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করার জন্য বিদ্যমান প্রযুক্তি কৃষি কার্যক্রমের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত ছিল না। এ সত্বেও কেউ যখন তার তুলনামূলক জ্ঞানের দ্বারা প্রাকৃতিক বস্তুর বাস্তবধর্মী ব্যবহারকে বিবেচনা করে তখন দেখা যায় যে, বাঙালী কৃষকগণ কর্তৃক ব্যবহৃত গতানুগতিক উপকরণ ব-দ্বীপের পরিবেশের সাথে খুবই মানিয়ে নিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, উপযুক্ত পরিমাণ রাসায়নিক সার ব্যবহারে যে পরিমাণ ফসল উৎপাদন হয়, প্রতি বাড়িতে উৎপাদিত মিশ্র-সারের সুবিবেচিত/ সুচিন্তিত প্রয়োগের মাধ্যমে তার চেয়ে কম ফসল উৎপন্ন হয় না।"[১৬] এরকম পরিবেশ নির্ভর চাষাবাদ সম্পর্কে আরও বর্ণনা তার বইতে ছড়ানো।

নৃতাত্ত্বিক বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর তাঁর বই "বাংলাদেশের গ্রাম"-এ বগুড়া, বরিশাল, পটুয়াখালীসহ বেশ কিছু গ্রামকে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং কৃষক সমাজকে দেখেছেন তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী উন্নয়ন, দারিদ্র্য, ধনতন্ত্র ও শ্রেণি মতাদর্শের প্রেক্ষিতে।[১৭]

গ্রামীণ দারিদ্র্যের ভিত্তি সামাজিক। জমির ফলন কমে আসে সেচ, বীজ কিংবা যন্ত্রপাতির অভাবে। অবশ্য দারিদ্র্যের এই ভিত্তি ছদ্মবেশী। জমি এবং কৃষকের মধ্যে যে বিষয়গুলো সম্পর্কিত তা হচ্ছে ভূমি ব্যবস্থা, বর্গা, বন্ধক এবং বাজার ব্যবস্থা। এসবই জমির ফসল হ্রাসের সাথে যুক্ত।

জমি থেকে জীবনযাপনের জন্য দরকার প্রকৃতিকে যথেষ্ট আদর করা অর্থাৎ জমিকে যত্ন করার ক্ষমতা। গ্রামীণ দারিদ্র্যের অর্থ জমিকে যত্ন করার সঙ্গতিহীনতা। কৃষকরা সেটা ভালো করেই জানে। বলা হয় যে, কৃষকরা অলস হয়ে যাচ্ছে, মাঠে পরিশ্রম করতে চায় না। কিন্তু সেটা সঠিক নয়। এখানে প্রশ্ন কঠোর পরিশ্রম কিংবা আলসেমী নয়। আসলে তা হচ্ছে জমির সম্ভাবনা বাড়ানো কেড়ে নেয়া হয়ে থাকে । ফলে দারিদ্র বৃদ্ধি পায়।

জমি সম্পদ নয়, সম্পদ মনে করার অর্থ জমিকে শোষণ করা। জমি হচ্ছে বাড়ি, আর এই বাড়ির ব্যবহারকারী হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া, পতঙ্গ, অনুজীব, পোকা মাকড়, সরীসৃপ এবং মানুষ। আর এখানে সবার অধিকার সমান। কিন্তু কৃষি গভীর প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে। মানুষ কৃষিকাজের মধ্যে দিয়ে জমিতে হস্তক্ষেপ করেছে সরাসরি।

মানব সমাজ আসলে জমিকেন্দ্রিক সমাজ। যখন থেকে প্রকৃতিকে মানুষ শোষণ করা শুরু করেছে, তখনই একটি পরিবারের বেঁচে থাকার জন্যে প্রয়োজনীয় জমি বন্টনের বদলে উৎপাদনের উপর অধিকতর জোর দেওয়া হয়েছে। এর ফলে তৈরি হয়েছে দুই ধরনের বিচ্ছেদ - উৎপাদক ও উৎপাদনের মধ্যে, মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে। দুই বিচ্ছেদের ভিত্তি হচ্ছে শোষণ। এভাবে তৈরি হয়েছে মানুষের মধ্যে শ্রেণীভেদ আর মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে বিরোধিতা। মানুষ হয়ে উঠেছে প্রকৃতির প্রভু।

অথচ একসময় মানুষ একাত্মক ছিল জৈবজগত ও উদ্ভিদ জগতের সাথে। সেই একাত্মতার ভিত্তিতে কাজ করেছে পারস্পরিক সহযোগিতা। বর্তমানে সবার ভূমিকা পর্যবসিত ক্রেতা কিংবা বিক্রেতার মধ্যে। জীবনের ভিত্তি, মূলকেন্দ্র সমাজ - এই বোধ যেন লুপ্ত মানুষের চেতনা থেকে। প্রতিযোগিতা এখন প্রধান। প্রকৃতি ও সমাজ সম্বন্ধে সর্বনাশা মনোভঙ্গির দরুন তৈরি হয়েছে প্রতিবেশের সরলীকরণ, ব্যাপক দূষণ।

গ্রাম ছাড়া মজুর তৈরি হয় অনুন্নত অর্থনীতি থেকে। একটি অর্থনীতি অনুন্নত কারণ, ঐ অর্থনীতিকে অনুন্নত করে তোলা হয়। শহরের লোকেরা ভাবে জমি থেকে কিছু করে জীবনযাপন সম্ভব। শহর বাঁচে গ্রামাঞ্চলের উদ্বৃত্তের উপর, সেজন্যে শহরে সমৃদ্ধি। ধনতন্ত্রের মূল মন্ত্র হচ্ছে পরিশ্রম, পরিশ্রমের মাধ্যমেই কোন ব্যক্তি কিংবা সমাজের মুক্তি সম্ভব। পরিশ্রম বিচার করা হয় উৎপাদনকে মূল্য হিসেবে ধরে নিয়ে। ধনতন্ত্র তো এখন পৃথিবীর অনেকটা জুড়ে আছে, তবু তো দারিদ্র্য কমে না। এখানেই ধনতন্ত্রের তত্ত্ব এবং বাস্তবে তা প্রয়োগের মধ্যেকার বৈপরীত্য।

অনুন্নত হওয়া অর্থ কেবল শোষিত হওয়া নয়, বরং কৃত্রিম এক আবদ্ধতায় অন্তরীণ হওয়া। গ্রামের মানুষ এখন গ্রাম ছেড়ে বাঁচতে চায়। দারিদ্রই তাকে শহরে ঠেলে দেয় না। তার জন্ম যে পরিস্থিতির মধ্যে সেখানে গতি নেই। গতিবেগ সঞ্চারের লক্ষ্যে কৃষক নিজেই গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে যায়, বিদেশে চলে যায়।

গ্রামাঞ্চলে বর্তমানে বৈপ্লবিক কোন রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম নেই। এর কারণে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা গ্রামীণ দারিদ্র্য তৈরি করে ও বজায় রাখে। এবং এটা হয়ে থাকে একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে। যে প্রক্রিয়া প্রায় অপরিবর্তনীয়ই বলা যায়। এর মাঝে যেসব ব্যক্তি উদ্যোগী তারা একটাই কাজ করে গ্রামাঞ্চল ছেড়ে চলে যায়। তাদেরকে ধরে রাখা এবং তাদের আশাকে সচল করার জন্যে যে রকম রাজনৈতিক দল এবং ব্যবস্থা গ্রামাঞ্চলে থাকা দরকার ছিল তার অভাব এর কারণ।[১৮]

সেজন্যে মানুষকে পূনরায় জমির কাছে ফিরে যেতে হবে, কৃষিকে দেখতে হবে স্বাভাবিক মানুষী সমাজের কর্ম হিসেবে। এভাবেই কৃষির মধ্যে দিয়ে মানুষী সমাজ এবং জমির সমাজ মিলে যাবে। এই মিলনের অর্থ মানুষ প্রকৃতির অংশ, প্রভু নয়। মানুষী চেতনা অনন্য, কিন্তুতা কখনই প্রভুত্ব ও শোষণের অধিকার দেয় না।

ধনতন্ত্র প্রভাবিত শহর ক্রমাগত দখল করছে গ্রামাঞ্চল, প্রসারিত হচ্ছে আমলাতন্ত্র। ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন হচ্ছে সমাজ থেকে, সমাজের মধ্যে তৈরি হচ্ছে অমানবিকতা আর আমলাতন্ত্রের মধ্যে এই অমানবিকতা আরও সর্বগ্রাসী হচ্ছে। আমাদের লক্ষ্য হবে মানবিক পরিসরে জমি ভিত্তিক কৃষক সমাজ গঠন, যেখানে থাকবে স্বশাসন এবং সামাজিক পরিস্থিতি বোঝার ব্যক্তিক বোধগম্যতা। যেখানে স্বেচ্ছাভিত্তিক পদ্ধতির প্রাধান্য থাকবে এবং তার মাধ্যমে অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ ও প্রতিবেশ পরিচালনা করবে গোটা সমাজ।[১৯]

গ্রামকে কখনো মনে হয় শিকলে বাঁধা। এখানে যারা বাসিন্দা তারা অজ্ঞ, অন্ধ। নিজের টুকরো জমি ছাড়া কিছু চেনে না। বাইরের জগত তার অজানা, কৌতূহলও নেই, তাই অজ্ঞ, নিরক্ষর। সে তার অভাব, দুঃখের মধ্যে নিমগ্ন, সে তার শত্রুকে চেনে না। তার মধ্যে ক্রোধ আছে কিন্তু চেতনা নেই। ক্রোধে মত্ত হলে সে পোড়ায়, কেড়ে নেয়, লড়াই করে। কিন্তু ক্রোধের অবসান হলেই সে ফের ফিরে যায় পূর্ব অবস্থানে। তার চেতনা হঠাৎ জ্বলে ওঠে, ফের নিভে যায়।

এ কথা সত্য নয়। কৃষক নিজের মধ্যে মগ্ন নয়। ঘুম থেকে উঠে সে কেবল চাষ করতে যায় আর ফিরে আসে - এই তার জীবনযাপন নয়। নিজের জমি কতদিন নিজ হাতে আছে, কতদিন থাকবে - এই বোধ তাকে কুরে কুরে খায়। জমির ফলন এক মওসুমে ভাল না হলে তাকে ঋণ, জমি বন্ধকের মধ্যে যেতে হয়। এই ধার এবং বন্ধকের পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে সে চিনতে থাকে শক্তিমানদের অবস্থান। অনেক সময় এই ধার কর্জের পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে সে জমির মালিক কৃষক থেকে ভূমিহীন কৃষকে পৌঁছতে থাকে। এভাবেই তার অস্তিত্ব রক্তাক্ত হতে থাকে, কৃষক চিনতে থাকে তার শত্রু। মানুষ সৃষ্টিশীল। যে মুহূর্তে তার বোধে ধরা দেয় ধনবানরা, ক্ষমতাবানরা সমাজের নিয়ন্তা, সেই মুহূর্তে সে ধনবানদের উপর নির্ভরশীল হওয়া সত্ত্বেও ক্ষমতার সর্বগ্রাসী অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে।[২০]

ভূমিহীন কৃষক কাজের খোঁজে শহরে যায়। মধ্য কৃষক জমিতে থাকে সন্তানদের পাঠায় শহরে কাজ বা লেখাপড়ার খোঁজে। তার মধ্যে কৃষিকাজ ও শহর ঘুরপাক খায়। তার ভাবনার মধ্যে দিয়ে শহরে পৌঁছায় গ্রামের অভাব, দুঃখ , প্রতিরোধ। সে বোঝে শত্রু গ্রামের মধ্যে যেমন আছে, শত্রু সারা সমাজব্যবস্থাতেই, এমনকি বৈশ্বিক পরিমন্ডলেও।

বর্তমান সমাজ প্রতিবেশ বিরোধী। এই সমাজের ভিত্তি ব্যক্তিক সম্পর্ক। এই সম্পর্ক থেকে তৈরি হয় ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্ক। ব্যক্তিকে ব্যক্তির বিরুদ্ধে, মানুষকে প্রকৃতির বিরুদ্ধে উপস্থাপিত করা হয়। পুঁজিবাদী সমাজের কানুন অনিঃশেষ বিস্তৃতি, উৎপাদনের জন্য উৎপাদন, ভোগের জন্য ভোগ। এসব বোধ প্রকৃতির উপর প্রভূত্ব সামাজিক ও ব্যক্তিক জীবনের পরম উৎকর্ষ বলে ধরে নেয়। আসলে প্রকৃতি ও মানুষ পরস্পর বিরোধী নয়, পরস্পর প্রবিষ্ট। এই প্রবিষ্টতা মানুষের মনোজ বোধে এবং প্রাকৃতিক পৃথিবীর বোধে কল্যাণের নির্দেশনা স্পষ্ট করে।

বাংলার গ্রাম ও ঐতিহ্য: ধানের ফুল ফোটা

৩. কবিতায় ও খনার বচনে বাংলার গ্রাম, কৃষি ও ঐতিহ্য

বাংলার কৃষি প্রতিবেশ ও ঐতিহ্য নিয়ে শুধুমাত্র যে প্রাবন্ধিক ও গবেষকগণ তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা করেছেন তাই নয়, কবি সাহিত্যিকদের লেখনীতেও ফুটে উঠেছে। তাদের মধ্যে খ্যাতিমান কয়েকজনের কবিতার কিছু চরণ এখানে উদ্ধৃত করা হল।

প্রথমেই বলতে হয় বাংলাদেশের বিখ্যাত পল্লী কবি জসিমউদ্দীন (১৯০৩-১৯৭৬) এর কথা।গ্রামবাংলার প্রকৃতির রূপ বর্ণনায় সরল অভিব্যক্তি এবং ভাষাগত সাহজিকতা তাকে জনপ্রিয় করেছে বিপুলভাবে। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে রয়েছে নকশীকাঁথার মাঠ, রঙিলা নায়ের মাঝি, বেদের মেয়ে, পদ্মা নদীর দেশে, সোজন বাদিয়ার ঘাটসহ আরও অনেক কাব্যগ্রন্থ। যেখানে কবি অকপটে বর্ণনা করেছেন বাংলার কৃষি ও এর ঐতিহ্যকে। গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য এবং লোকজ জীবন জসিমউদ্দীনের কবিতায় নতুন রূপ লাভ করেছে। এজন্যে পল্লী কবি হিসেবে তাঁর বিশেষ ও স্বতন্ত্র পরিচিতি রয়েছে।

পল্লীকবি জসিমউদ্দীন বিখ্যাত পল্লীর রূপ বর্ণনায়। 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্য গ্রন্থ এবং সেখানে কৃষি এবং চাষের অনুপম বর্ণনা উঠে এসেছে। যা বাংলার চিরন্তন শস্য সম্ভারের কথা তুলে ধরে। তিনি লিখেছেন:[২১]

সোজন যখন কৃষান হইবে, সবগুলো ক্ষেত ভরি
কুসুম ফুলের করিবে সে চাষ, মনের মতন করি
....
পাট মেরে সে যে নিড়াইয়া দিবে বউ টুবানীর চারা
ক্ষেত ভরি হবে ফুলের বাহার দুলীর খুশীর পারা
....
বাছাই করিয়া করিবে সোজন মাঘী মটরের চাষ
শাক তুলে তুলে সেদিন দুলীর পুরিবে মনের আশ
জমিরের ক্ষেতে ছাই মিঠে আলু, দেখো সোজনের ক্ষেতে
শাকের মামুদ আলু হবে, কেউ হেরেনি যা চক্ষেতে।[২২]

এখানে বর্ণিত হয়েছে স্থানীয় জাতের বিভিন্ন সবজীর নাম যেমন কুসুম ফুল, অর্থাৎ সরিষার চাষ, মাঘী মটর, বউ টুবানীর চারা, মিঠে আলু, শাকের মামুদ আলু। এলাকাভিত্তিক এই যে বৈচিত্র্যময় শাক, সবজী, আলু- এসব আজ শুধু কাব্য গ্রন্থে, বাস্তবে এর অস্তিত্ব হারিয়ে গেছে।

জীবনানন্দ দাস কবি ও শিক্ষাবিদ, জন্ম ১৮৯৯ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের বরিশাল জেলায়। প্রকৃতির কবি জীবনানন্দ দাশ বাংলার রূপ এবং প্রকৃতির বর্ণনা করেছেন তার কবিতায় অতুলনীয়ভাবে। যেখানে ফুটে উঠেছে প্রকৃতির বৈচিত্র্যময়তা, বিভিন্ন গাছ গাছালী এবং স্থানীয়ভাবে জীববৈচিত্র্যের দিকটি। জীবনানন্দের কবিতায় আছে স্বদেশপ্রেম, স্বাদেশিকতার রাজনীতি। ষাটের দশকে বাঙালীর জাতিসত্তা বিকাশের আন্দোলনে এবং ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালী জনতাকে তাঁর রূপসী বাংলা কাব্য গ্রন্থ তীব্রভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যময় নিসর্গ তারঁ কাব্যে হয়ে উঠেছে চিত্রময়। বিশেষত: রূপসী বাংলা কাব্য গ্রন্থে যেভাবে আবহমান বাংলার চিত্ররূপ ও সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়েছে, তাতে তিনি 'রূপসী বাংলার কবি' হিসেবে খ্যাত হয়েছেন। এখানে তার কয়েকটি উদ্ধৃত করা হলো।[২৩]

"বঁইচির ঝোপ শুধু- শাঁই বাবলার ঝাড়- আর জাম হিজলের বন
কোথাও অর্জুন গাছ - তাহার সমস্ত ছায়া - এদের নিকটে টেনে নিয়ে
কোন্ কথা সারাদিন কহিতেছে ওই নদী, এ নদী কে?"[২৪]

"কদমের ডালে আমি শুনেছি যে লক্ষীপেঁচা গেয়ে গেছে গান
নিশুতি জ্যোৎস্না রাতে - টুপ টুপ টুপ টুপ সারারাত ঝরে
শুনেছি শিশিরগুলো।"[২৫]

"আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে - এই বাংলায়
হয়ত মানুষ নয় - হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে,
হয়তো ভোরের কাক হয়ে, এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল ছায়ায় ।"[২৬]

পৃথিবীর কোন পথে নরম ধানের গন্ধ- কলমীর ঘ্রাণ,
হাঁসের পালক, শর, পুকুরের জল, চাঁদা সরপুটিদের
মৃদু ঘ্রাণ, কিশোরীর চাল ধোওয়া ভিজে হাত- শীত হাতখান
কিশোরীর পায়ে দলা মুথা ঘাস, - লাল লাল বটের ফলের
ব্যথিত গন্ধে নিরবতা- এরি মাঝে বাংলার প্রাণ
আকাশে সাতটি তারা যখন উঠেছে ফুটে, আমি পাই টের ।[২৭]

"কোথায় সে নিয়ে গেছে সঙ্গে করে সেই নদী, খেত, মাঠ
ঘাস, সেই দিন, সেই রাত্রি, সেই সব ম্লান চুল, ভিজে সাদা
হাত, সেই সব নোনা গাছ, করমচা, শামুক, গুগলি, কচি তাল শাঁস,
সেই সব ভিজে ধুলো, বেলকুঁড়ি ছাওয়া পথ-ধোঁয়া ওঠা ভাত,
কোথায় গিয়েছে সব?- অসংখ্য কাকের শব্দে ভরিছে আকাশ
ভোররাতে - নবান্নের ভোরে আজ বুকে যেন কিসের আঘাত ।[২৮]

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) বাংলাদেশের জাতীয় কবি এবং অবিভক্ত বাংলার সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব । নজরুলের ইতিহাস চেতনায় ছিল সমকালীন এবং দূর ও নিকট অতীতের ইতিহাস, সমভাবে স্বদেশ ও আন্তর্জাতিক বিশ্ব । নজরুল কাজ করেছেন কবিতা, গল্প, নাটক, প্রবন্ধ এবং গান নিয়ে । নজরুলের কবিতায় ও গানে তৎকালীন ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছিল উচ্চকন্ঠের । স্বদেশপ্রেম ও দেশের প্রতি ভালবাসার প্রকাশ ছিল তার কবিতার পরতে পরতে । সেই সাথে ছিল গ্রাম বাংলার রূপ বর্ণনা, যা কিনা একান্তই দেশের মাটি এবং গাছগাছালি নিয়ে তার ভালবাসার প্রকাশ । নিচে তারই কিছু নমুনা দেওয়া হল ।[২৯]

আমার শ্যামলাবরণ বাংলা মায়ের
রূপ দেখে যা, আয় রে আয়
গিরি-দরী-বনে-মাঠে প্রান্তরে রূপ ছাপিয়ে যায়,
ধানের ক্ষেতে বনের ফাঁকে
দেখে যা মোর কালো মা'কে
ধুলি রাঙা পথের বাঁকে বৈরাগিনী বীণ বাজায় ।।
....

ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি আমার দেশের মাটি
এ দেশেরই মাটি জলে এ দেশেরই ফুলে ফলে
তৃষ্ণা মিটাই মিটাই ক্ষুধা পিয়ে এরি দুধের বাটি
....
পলাশ ফুলের মউ পিয়ে ঐ
বউ কথা কও উঠল ডেকে
শিস দিয়ে যায় উদাস হাওয়া
নেবু-ফুলের আতর মেখে।
সবুজ শোভার ঢেউ খেলে যায়
ঢেউ খেলে যায় নবীন আমন ধানের ক্ষেতে
হেমন্তের ঐ শিশির নামায় হিমেল হাওয়া
সেই নাচনে উঠল মেতে।
....
একি অপরূপ রূপে মা তোমায় হেরিনু পল্লী জননী
ফুলে ও ফসলে কাদামাটি জলে ঝলমল করে লাবনী
রৌদ্রতপ্ত বৈশাখে তুমি চাতকের সাথে চাহ জল
আম কাঁঠালের মধুর গন্ধে জ্যৈষ্ঠে মাতাও তরুতল
ঝঞ্ঝার সাথে প্রান্তরে মাঠে কভু খেল লয়ে অশনি।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাজে প্রকৃতি প্রাধান্য পেয়েছে ব্যাপকভাবে। রবীন্দ্রনাথ একজন গভীর প্রকৃতি প্রেমিক ছিলেন। তিনি প্রকৃতিকে আমাদের সত্তারই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখেছেন। বর্তমানে পরিবেশ রক্ষার বিষয়টি যেভাবে বিশ্বব্যাপী প্রসার লাভ করেছে, তিনি তা অনুধাবন করেছিলেন তাঁর সময়ের পরিসরে। তিনি প্রকৃতির বস্তুগত দিকটিকে যেমন স্বীকার করেছেন তেমনি তার প্রকৃতি ভাবনা চেতনার গভীরতম স্থানে প্রোথিত করেছেন। প্রকৃতির যে নিজস্বতা, স্বকীয়তা তাকে তিনি তাঁর কবিতায়, গানে এবং সাহিত্যে সচেতনভাবে ধারণ করেছেন। বনের নিঃশব্দতায়, ফুলের সৌন্দর্য্যে, নদী ঝরণার কলতানে, সাগরের ঢেউয়ের দোলায়, নীল আকাশ আর সবুজ ঘাসের অপার সৌন্দর্য্যে এবং পরিবেশের সুরক্ষায় প্রকৃতি বন্দনা করে গেছেন। তিনি গেয়েছেন প্রকৃতির জয়গান, যা কিনা এই পৃথিবীর জীববৈচিত্র্যকেই এক অর্থে স্থায়ীত্বের নির্দেশনা দিয়ে গেছে। তাঁর সাহিত্য আমাদেরকে প্রাণিত করে এই জীববৈচিত্র্যকে টিকিয়ে রাখতে। কারণ জীববৈচিত্র্য এবং এই প্রকৃতি যদি অবশিষ্ট না থাকে তাহলে তার গান, কবিতা অসার হয়ে যায়, আবেদনহীন হয়ে পড়ে। তিনি প্রকৃতির বন্দনা করেছেন এভাবে-৩০

বিশ্ববীণা রবে বিশ্বজন মোহিছে
স্থলে জলে নভতলে, বনে উপবনে
নদী-নদে গিরিগুহা পারাবারে
নিত্য জাগো সরস সঙ্গীত মধুরিমা
নিত্য নৃত্যরস ভঙ্গিমা।

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি চেতনা এবং রূপবৈচিত্র্যের সন্ধান আমরা পাই তাঁর বিভিন্ন ঋতুভিত্তিক গানের মধ্যে। যা কিনা এক গভীর জীবন দর্শনের প্রকাশ হিসেবে আমাদের সামনে উন্মোচিত হয়। তিনি লেখেন:

তপস্বিনী হে ধরনী, ওই যে তাপের বেলা আসে
তপের আসন খানি প্রসারিল মৌন নীলাকাশে।

বর্ষাকে ঋতুকে নিয়ে লেখা কবির অজস্র কবিতায় প্রকৃতি, দেশজ জীবনযাত্রা এসেছে গভীরভাবে। বর্ষা ঋতু হচ্ছে উর্বরতার প্রতীক। সোনার তরী কবিতায় ধান ভর্তি নৌকা দেখে কবি উচ্ছাস প্রকাশ করেন -

রাশি রাশি ভারা ভারা, ধান কাটা হলো সারা
ভরা নদী ক্ষুরধারা, ঘন তমসা।
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা।

জীববৈচিত্র্য: ঐতিহ্যিক পাকা ধানের মাঠ

শরৎ ঋতুতে মাঠের পর মাঠ ধানের ক্ষেত বাতাসে দোল খাচ্ছে - বাংলার এ এক অনুপম দৃশ্য । আগে যেহেতু আমন ধানই ছিল ধান চাষের ক্ষেত্রে অন্যতম তাই এ সময়ের ধান ক্ষেত মানবের চিত্তে এক অন্য রকম দোলা দিয়ে যেত। কবি মনে সেই দোলা কবিতার ছন্দে, গানে প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাই শরৎকে নিয়ে এভাবে লিখেছেন-

আজ ধানের খেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরি খেলা
নীল আকাশে কে ভাসালে সাদা মেঘের ভেলা

হেমন্তে যখন প্রকৃতি শস্যে ভরপুর হয়ে যায় তখন কবিকে তা ভাবায় এভাবে-

ধরার আঁচল ভরে দিলে প্রচুর সোনার ধানে
দিগঙ্গনার অঙ্গন আজ পূর্ণ তোমার দানে।

শীতে বিদ্যমান তোলা ফসলে গৃহস্থের ঘরে এক ধরনের পূর্ণতা বিরাজ করে। যদিও প্রকৃতি তার বসন ছেড়ে বৈরাগীর মূর্তি ধরতে থাকে। কবি বর্ণনা করেন-

আয় আয় আয়
ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে
মরি হায় হায় হায়।
....
শীতের হাওয়ায় লাগলো নাচন
আমলকির এই ডালে ডালে
পাতাগুলি শিরশিরিয়ে ঝরিয়ে দিল তালে তালে।

বসন্ত ঋতু হচ্ছে প্রকৃতিকে পুরনো লেবাস ছেড়ে নতুনরূপে উপস্থাপনের কাল। বাংলার প্রকৃতি বসন্তে এমনভাবে হেসে উঠে এবং সাজায় যে সেই সাজ জীবনের চেতনাকে প্রেরণা দেয়:

ওরে গৃহবাসী, খোল দ্বার খোল, লাগল যে দোল্
স্থলে জলে বনতলে লাগল যে দোল্
রাঙা হাসি রাশি রাশি অশোকে পলাশে
রাঙা হাসি মেঘে মেশা প্রভাত আকাশে,
নবীন পাতায় লাগে রাঙা হিল্লোল।

রবীন্দ্রনাথের মতে প্রকৃতি আমাদের জীবনের অংশ। তাই তিনি আমাদেরকে প্রকৃতির কাছে ফিরে যেতে ডাক দিয়েছেন। আমাদেরকে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে চিনতে, জানতে এবং একে বাঁচিয়ে রাখার প্রেরণা দিয়ে থাকেন এবং তিনি আহ্বানও জানান সকলকে। কারণ তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, মানব জীবনের পরিপূর্ণতা নিহিত প্রকৃতির মাঝে। তিনি বলেছেন-

“ফিরে চল মাটির টানে-
যে মাটি আঁচল পেতে চেয়ে আছে মুখের পানে ।

বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি ডাক দেন-

আয় আমাদের অঙ্গনে
অতিথি বালক তরুদল
মানবের স্নেহ সঙ্গ নে চল
চল আমাদের ঘরে চল”

রবীন্দ্রনাথের চোখে গ্রাম ছিল এমন-

“মাঠের শেষে গ্রাম
সাত পুরিয়া নাম ।
চাষের তেমন সুবিধে নেই কৃপণ মাটির গুনে
পঁয়ত্রিশ ঘর তাঁতির বসত, ব্যবসা জাজিম বুনে ।
নদীর ধারে খুঁড়ে খুঁড়ে পলির মাটি খুঁজে
গৃহস্থরা ফসল করে কাঁকুড়ে তরমুজে
ওই খানেতে বালির ডাঙা মাঠ করেছে ধু ধু
ঢিবির পারে বসে আছে গাঁয়ের মোড়ল বধু
সামনে মাঠে ছাগল চড়ছে কটা
শুকনো জমি নেইকো ঘাসের ঘটা ।”

মূলত শিলাইদহ ছিল বরেন্দ্র এলাকার মধ্যে, গড়াই, পদ্মা নদীর এলাকায় ।গ্রীষ্মে মাটি ফেটে চৌচির হয়ে যায় । তিনি লেখেন-

আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে
বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে
পার হয়ে যায় গরু, পার হয় গাড়ি
দুই ধার উঁচু তার ঢালু তার পাড়ি
চিক চিক করে বালি, কোথা নেই কাদা
একধারে কাশবন, ফুলে ফুলে সাদা ।

রবীন্দ্রনাথ “ছিন্ন পত্রে” প্রকৃতির এক অসামান্য চিত্রকল্প আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন-

“বোট খুলে দিয়েছে । মাঝে মাঝে ঘন শৈবালের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে খস খস শব্দ হচ্ছে । সেই শৈবালের ওপর অনেকগুলো ছোট ছোট কচ্ছপ আকাশের দিকে সমস্ত গলা বাড়িয়ে দিয়ে রোদ পোহাচ্ছে ।”

পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষায় রবীন্দ্রনাথকে তাই আমরা আমাদের নিত্য দিনের সঙ্গী করতে পারি ।

খনার বচন

আমরা জানি প্রবাদ লোকজীবন ও সংস্কৃতির বিশিষ্ট অঙ্গ, যার পূর্ণাঙ্গ রূপ বহুলাংশে আঞ্চলিকতার মধ্যে লালিত। অঞ্চল বিশেষে ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক পটভূমি, সামাজিক অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য, স্থানীয় শব্দ সম্ভার এবং প্রতিবেশগত বৈচিত্র্য নিয়ে সৃষ্টি হয়ে থাকে। খনার বচন তাই প্রবাদ বাক্যে পরিণত।[৩১]

খনা জ্যোতিষ শাস্ত্রে নিপুনা ও বচন রচয়িতা বিদুষী নারী। তাঁর আবির্ভাবকাল ৮০০-১২০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে অনুমান করা হয়। তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় কিংবদন্তি নির্ভর এবং সেখানে দ্বিমত আছে। খনা তাঁর প্রজ্ঞা দিয়ে এমন প্রতিপত্তি লাভ করেন যা রাজসভায় তার স্বামী মিহিরের প্রাধান্য হারাবার মত অবস্থা তৈরি করে। পিতার আদেশে মিহির খনার জিহ্বা কেটে দেন এবং এর কিছুদিন পর তাঁর মৃত্যু হয়।[৩২]

খনা বাংলার লোকজ জীবন সম্পর্কে অনেক প্রবাদ রচনা করে গেছেন যা 'খনার বচন' নামে পরিচিত। খনার বচনের অধিকাংশেরই বিষয়বস্তু চাষবাস, জল-হাওয়া, তিথি গণনা প্রভৃতি প্রসঙ্গে। খনার বচনগুলো প্রজ্ঞার বচন। বাংলার বহুবিচিত্র জীবন ব্যবস্থায় তা গভীর প্রভাব ফেলেছিল। একারণে দীর্ঘ সময় ধরে বচনগুলো মানুষের মুখে মুখে প্রবাহিত ছিল। এখন বচনগুলো লিখিতভাবে পাওয়া যায়, যদিও অনেক বচন হারিয়ে গেছে। বন্যা, মড়ক, বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি এবং ঋতুভিত্তিক চাষ সম্পর্কে খনার বচনগুলো এখনও প্রয়োগযোগ্য। কারণ এসব বচনগুলো তাঁর দীর্ঘদিনের পর্যবেক্ষণের ফসল। বাংলার ঋতু বিশেষে কোন চাষ ভাল হবে, কিভাবে বুনলে এবং কখন বৃষ্টি হলে ফসল কৃষকের অনুকূলে বা প্রতিকূলে যাবে সে সম্পর্কে যেসব বচনগুলো প্রচলিত আছে এখনও তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু এখানে তুলে ধরা হলো।

"বৈশাখের প্রথম জলে, আউশ ধান দ্বিগুণ ফলে।
খনা বলে শুন ভাই, তুলায় তুলা অধিক পাই।"

অর্থাৎ বৈশাখ মাসে ভাল বৃষ্টি হলে আউশ ধানের আবাদ ভাল হয় এবং এই জল তুলার উৎপাদনের জন্যেও ভাল।

"বৈশাখ জ্যৈষ্ঠেতে হলুদ রো,
দাবা পাশা ফেলিয়া থো।
আষাঢ়ে শ্রাবণে নিড়ায়ে মাটি
ভাদরে নিড়ায়ে করবে খাঁটি
এর অন্যথা পুতলে হলদি
পৃথিবী বলে তাতে ফল দি।"

"জ্যৈষ্ঠে খরে, আষাঢ়ে ঝরে,
কেটে মেড়ে, গোলা ভরে।"
"ষোলো চাষে মুলা, তার অর্ধেক তুলা
তার অর্ধেক ধান, বিনা চাষে পান।"

বর্তমান কালের কৃষি বিজ্ঞানীরাও বলেন যে, ধান বোনার জন্যে চার চাষের প্রয়োজন ।

“আষাঢ়ের পঞ্চদিনে, রোপণ যে করে ধানে
মুখে থাকে কৃষিবল, সকল আশা হয় সফল ।”

ধান রোপণের সময় কী হওয়া উচিৎ, ধান লাগানোর নিয়ম নিয়ে খনার বচন এরকম ।

“শ্রাবণের পুরো, ভাদ্রের বারো”

পুরো শ্রাবণ মাস এবং ভাদ্র মাসের বারো তারিখ পর্যন্ত ধান রোপনের উৎকৃষ্ট সময় ।

“কার্তিকের উণো জলে, খনা বলে দুনো ফলে ।”

কার্তিক মাসে বৃষ্টি কম হলে এবং ধানক্ষেতে পানি কম থাকলে ফসল দ্বিগুণ পরিমাণ ফলে ।

“যদি বর্ষে আগনে, রাজা যায় মাগনে ।”

অগ্রহায়ণ মাসে বৃষ্টি হলে ফসলের ক্ষতি হয়, দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং দেশের রাজাকে তখন সাহায্যের জন্যে ভিক্ষা করতে হয় ।

“মায়ের মাটি হীরের কাঠি, ফাগুনের মাটি সোনা
চৈতের মাটি যেমন তেমন, বৈশাখের মাটি নোনা ।”

মায়ের মাটি অর্থাৎ চাষ দেওয়া জমি, হীরের কাঠি অর্থ হীরের কণ্ঠমালা । বৈশাখের মাটি লবন জলের মত, যেখানে শস্য উৎপাদিত হওয়া কঠিন ।

হালচাষ প্রসঙ্গে এবং চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে আরও যে বচন আছে–

“শুভক্ষণ দেখে করবে যাত্রা
পথে যেন না হয় অশুভ বার্তা
মাঠে গিয়ে আগে দিক নিরূপন
পূর্ব দিক হতে হল চালন
যা কিছু আশা পুরবে সকল
নাহি সংশয়, হবে ফসল ।”

শাক-সবজি চাষ প্রসঙ্গে খনার উক্তি–

“শোনরে বাপু চাষার বেটা
মাটির মধ্যে বেলে যেটা
তাতে যদি বুনিস পটল
তাতেই তোর আশা সফল ।”

“হাত বিশ করি ফাঁক
আম কাঠাল পুতে রাখ
গাছ-গাছালি ঘন সবে না
গাছ হবে তার ফল হবে না ।”

“বলে গেছে বরাহের পো
দশটি মাসে বেগুন রো’ ।
চৈত্র বৈশাখ দিবি বাদ
ইথে নাই কোন বিবাদ
ধরলে পোকা দিবি ছাই
এর ভালো উপায় নাই ।
খরা ভুঁয়ে ঢালবি জল
সকল মাসেই পাবি ফল ।”

ধান এবং কলা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি বচন রচনা করেছেন খনা, নিঃসন্দেহে এটি অর্থনৈতিক কারণে ।

“তিনশ ষাট ঝাড় কলা রুয়ে
থাক গেরস্ত ঘরে শুয়ে
কলা রুয়ে না কেট পাত
তাতেই কাপড় তাতেই ভাত ।”

“আগে বাঁধো আলি, রোও তবে শালি
না যদি ফল ফলে, গালি পেড়ো খনা বলে ।”

“উঠোন ভরা লাউ শশা,
খনা বলে লক্ষীর দশা ।
ছাইয়ে লাউ, উঠানে ঝাল
কর বাপু চাষার ছাওয়াল”

সবজী চাষে পোকার আক্রমণ থেকে মুক্তির জন্য ছাই যে কীটনাশক হিসেবে ব্যবহার করা হত তার প্রমাণ মেলে এই বচনে, যা কিনা বর্তমানের জৈব কৃষিতে বলা হয়ে থাকে ।

যেসব সবজিগুলো আমাদের খাদ্য তালিকায় প্রাধান্য এবং মর্যাদা পায় না, যেমন ওল, মানকচু সেগুলোর চাষ পদ্ধতি সম্পর্কেও তার বচন পাওয়া যায় ।

"ফাগুনে না রুলে ওল, শেষে হয় গন্ডগোল
ছায়ার ওলে চুলকায় মুখ, কিন্তু তাতে নেইকো দুখ ।"

গাছের ওষধি গুণও খনার বচন থেকে বাদ যায়নি । বলেছেন–

"নিম নিশিন্দা যথা, মানুষ কী মরে তথা"

এভাবে খনা মানুষের জীবনের নানা দিককে তার প্রজ্ঞা দিয়ে সমৃদ্ধ করে গেছেন । যা আমাদের ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে সংযুক্ত হয়ে গেছে । এভাবেই আমাদের কবিতা, গানে, গল্প উপন্যাসে, চিত্রকলায় তথা সংস্কৃতিতে কৃষি, কৃষক, চাষাবাদ এবং এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে সম্পৃক্ত জীববৈচিত্র্য, প্রতিবেশ আমাদের বাংলার ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে ।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবী ক্রমশঃ উষ্ণ হয়ে যাচ্ছে

৪. কৃষি প্রতিবেশ : বৈশ্বিক রাজনীতি ও দূষণ

সারা বিশ্বেই আজ বৈশ্বিক পুঁজিবাদী ধ্যান-ধারণা ও পদ্ধতি আধিপত্যশীল। এর শুরু বিগত শতাব্দীতে, যখন কিনা উন্নয়ন মতাদর্শ উন্নয়নশীল দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণের অন্যতম উপায় হিসেবে প্রচারিত হতে থাকে। এরই পথ ধরে মুক্তবাজার অর্থনীতি বিশ্বব্যাপী প্রসার লাভ করতে থাকে, সেই সাথে রাষ্ট্রযন্ত্র ক্রমশ: শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে। নাগরিক সমাজের অন্তর্নিহিত শক্তির প্রকাশ যেসব ছিল যেমন গ্রামীণ মেলা, কুটিরশিল্পের বৈচিত্র্যময়তা, দেশজ প্রযুক্তি, সংস্কৃতিতে আত্মপরিচয়ের চেষ্টা - বিশ্ববাজারের জোয়ার এসবের ভিত্তি ক্রমশ: নড়বড়ে করে দেয় । অন্যদিকে দেশের মানুষের চাহিদা কাঠামো বদলে যেতে থাকে গণমাধ্যম ও বহুজাতিক কর্পোরেট শক্তির আগ্রাসনের কারণে। দেখা যায় পুরো তৃতীয় বিশ্বের অর্থনীতি বিশ্ববাজারের অংশে পরিণত হয়েছে প্রায়। ফলে দেশীয় উৎপাদকেরা তাদের ঐতিহ্যবাহী পেশা থেকে সরে যাচ্ছে। বিশ্বব্যাপী একরৈখিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার কারণে মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে নানা বৈচিত্র্যের পণ্য স্বাদ থেকে। অর্থনৈতিক বৈশ্বিকীকরণের পাশাপাশি চলছে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আগ্রাসন, যার ফলে প্রতিবাদী সংস্কৃতির ধারা মিইয়ে যাচ্ছে। মৌলবাদিতার মতাদর্শ ও সন্ত্রাস বৃদ্ধি পাচ্ছে।

“বৈশ্বিকীকরণের” ধারণা বৃহৎ কোম্পানী দ্বারা আন্তর্জাতিক ব্যবসা হিসাবে কৃষির উৎপাদনকে প্রভাবিত করেছে। ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন-এর উদ্ভব এবং মুক্তবাণিজ্য ব্যবস্থা, সরকারি ব্যয় সংকোচন নীতি, পেটেন্ট বাণিজ্য ও একচ্ছত্র আধিপত্য কৃষিতে প্রকৃত কৃষকদের সংশ্লিষ্টতাকে হ্রাস করেছে, যারা কিনা যথার্থই প্রাকৃতিক সম্পদ ও বীজের মালিক।

প্রধান দানাশস্য ভিত্তিক খাদ্যের বৈশ্বিক চাহিদা এবং বিপুল পরিমাণে আন্তর্জাতিক বিনিময়, হ্রাস করেছে বৈচিত্র্যপূর্ণ স্থানীয় শস্য উৎপাদন সংস্কৃতি- যা কিনা এগ্রোইকোলজি বা জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি হিসাবে পরিচিত। এই কৃষি বৈচিত্র্যময় প্রতিবেশে প্রান্তিক কৃষকদের জীবিকানির্বাহ ও টিকে থাকার উপায়। রাসায়নিক সার এবং বালাইনাশক প্রয়োগ ভিত্তিক একক শস্য সংস্কৃতি (monocrop culture) প্রান্তিক কৃষকদের উৎপাদনের ক্ষমতা হ্রাস করেছে, শুধু তাই নয় বরং উদীয়মান কর্পোরেট ফার্মের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে অপারগ হয়ে তাদেরকে কৃষিতে সম্পদ বিনিয়োগ থেকে বিরত করেছে। কৃষক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে না পেরে তার পেশা পরিবর্তন করছে অথবা গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে শ্রমজীবী হিসাবে নিজেকে নিয়োজিত করছে।[৩৩]

উন্নয়নের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়নই প্রধান মাপকাঠি ধরা হয়েছে। এখানে আয় ও সম্পদ বণ্টনে ইকুয়িটি বা সমতার প্রশ্ন উহ্য করে রাখা হয়েছে। সে জায়গায় দারিদ্র্য বিমোচন প্রাধান্য পেয়েছে, যা কিনা বর্ণনা করা হয় কিছু মৌলিক চাহিদার প্রেক্ষিতে। যেখানে মূল দর্শন হলো আন্তর্জাতিক পুঁজির মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশের সস্তা শ্রম শোষণ করা। শ্রমের মজুরী অত্যন্ত নিচুতে রেখে কর্মসংস্থান বাড়িয়ে সেটাকেই দারিদ্র্য বিমোচন হচ্ছে বলে প্রতিষ্ঠিত করা।

বিশ্ব পুঁজির আধিপত্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে উন্নয়ন সাহায্য দিয়ে শর্তাধীন করে রাখা হচ্ছে। এসব দেশ বেসরকারীকরণের জন্যে প্রয়োজনীয় সবরকম অর্থনৈতিক সংস্কার করার মাধ্যমে সস্তা শ্রম শোষণ করার জন্য বিদেশী পুঁজির দেশে আসার পথ প্রশস্ত করছে। যা দেশের ভিতরকার ধনী শ্রেণিকে আরও ধনী করছে এবং সমাজে বৈষম্য বৃদ্ধি করছে। সেই সাথে একটা ভোগবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা করছে। যেখানে মানবিকতা বিপর্যস্ত হচ্ছে। সেই সাথে প্রকৃতি ও পরিবেশের উপর মানুষের আধিপত্য বিস্তৃত করছে। বিবিএস প্রকাশিত ‘খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১৬’ অনুযায়ী দেশের মোট আয়ের ২৮% রয়েছে ৫% ধনী পরিবারের হাতে, আর সবচেয়ে দরিদ্র ৫ শতাংশ পরিবারের আয় মাত্র ০.২৩%।[৩৪]

এসব কিছুই নিয়ন্ত্রণ করছে কিছু কর্পোরেট গোষ্ঠী, যাদের নেটওয়ার্ক সারা বিশ্বব্যাপী ছড়ানো। যাদের লক্ষ্য হলো বিশ্ববাজার দখল ও লোকজ সৃজনীশক্তি বিনষ্ট করা। এজন্য স্থানীয় সংস্কৃতি, কৃষি উৎপাদন পদ্ধতি, মানুষের সাথে জীববৈচিত্র্যের সম্পর্কের মত বিষয়গুলোকে পাশ কাটিয়ে বিশ্বব্যাপী একই প্রকৃতির ‘একরৈখিক’ উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ এর মত সৃষ্ট আন্তর্জাতিক অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানসমূহও এর পেছনে শক্তি হিসেবে কাজ করছে। এসব কিছুই করা হচ্ছে উন্নয়নের নামে, দারিদ্র্য বিমোচনের নামে, বিদেশী সাহায্যের নামে। এটা সত্য যে, উন্নয়নশীল দেশগুলোর বিদেশী সহায়তা দরকার, তবে তা অবশ্যই হতে হবে সেইসব দেশের প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে, তাদের শর্তের ভিত্তিতে, কোন আরোপন, নির্ভরশীলতা সেখানে প্রযোজ্য হতে পারে না।

ঔপনিবেশিক মতাদর্শের আগ্রাসনের কারণে বাংলাদেশেও পশ্চিমা উন্নয়নের মডেল গ্রামাঞ্চলে এবং কৃষক সমাজে প্রবেশ করে। সেই উন্নয়ন প্রকৃতপক্ষেই আমাদের দেশীয় প্রেক্ষাপটে প্রযোজ্য কী না তা যাচাই করা হয় নি। বিভিন্ন দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচির মাধ্যমে এই উন্নয়নের কথা ভাবা হয়েছে। কিন্তু যে দরিদ্র জনগণের জন্য উন্নয়ন, তাদের নীতি নির্ধারণী আলোচনায় ডাকা হয় না। উন্নয়ন তাই হয়ে যায় চাপিয়ে দেওয়া একটা ব্যাপার। এটা আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে যেমন তেমনই দেশীয় ক্ষেত্রের জন্যেও প্রযোজ্য।[৩৫]

ঔপনিবেশিক মনোভঙ্গির কারণে পশ্চিমা ধাঁচের যে উন্নয়ন মডেল দেশে আনা হয় তা মূলত: ধনতান্ত্রিক মডেলের উন্নয়ন। যার ফলাফলে চলে আসে অসমতা।

বর্তমান কৃষির বিভিন্ন দিক

মুক্তবাজার অর্থনীতির এই দাপট থেকে কৃষি বিযুক্ত নয় বরং আধিপত্য বিস্তারের একটা গুরুত্বপূর্ণ খাত। তাই উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায়, ১৯৬০ এর দশকে বিশ্বব্যাংক 'অনুন্নত' দেশগুলোতে সেচ প্রকল্প ও ফসল-বিজ্ঞান গবেষণায় সহায়তা ও ঋণ প্রদান বৃদ্ধি শুরু করে। এসময় কৃষি-উন্নয়ন প্যাকেজের অংশ হিসেবে, 'উচ্চ ফলনশীল' (উফসি) জাতের বীজ, সিনথেটিক সার ও কীটনাশক কৃষকের কাছে বিক্রি করা শুরু হয়। এসময় রকফেলার ও ফোর্ড ফাউন্ডেশন ফিলিপাইনে আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট (ইরি-IRRI) ও মেক্সিকোতে আন্তর্জাতিক গম উন্নয়ন কেন্দ্র (CIMMYT) প্রতিষ্ঠা করে। কৃষির আধুনিকায়নের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির এই ঘটনাকে 'সবুজ বিপ্লব' বলা হয়।

কৃষির ক্ষেত্রে যা হয় তা হচ্ছে সবুজ বিপ্লবের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা বিধান। যা কী না একফসলী চাষের পদ্ধতিকে স্থাপন করে কৃষকদের মাঝে, আর হারিয়ে যায় আঞ্চলিক কৃষি বৈশিষ্ট্য। কৃষি ব্যবস্থাকে কৃষি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত করে বাইরে থেকে আমদানী করা কৃষি উপকরণের উপর নির্ভরশীল করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। বীজের সার্বভৌমত্ব চলে যায়। কৃষিজ দ্রব্যের বাণিজ্যকরণ ও কৃষির আধুনিকীকরণ সমার্থক হয়ে যায়।

১৯৬৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উইলিয়াম গড সবুজ বিপ্লব কথাটি চালু করেন আর ১৯৬৯ সালের ডিসেম্বরে মার্কিন কংগ্রেসে এটি পররাষ্ট্রনীতি হিসাবে গৃহিত হয়।[৩৬] যার মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সার, বিষ, এবং সব ধরনের কৃষি যন্ত্রপাতিও উপকরণ বিক্রির একটা সুযোগ তৈরি হয়।[৩৭]

তাদের যুক্তি ছিল যে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় এবং ক্ষুধা মুক্তির জন্য দানা শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা দরকার। সেক্ষেত্রে ধান বা গমের মত একক ফসলের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সবুজ বিপ্লবকে প্রবর্তন করার জন্যে কৃষক এবং কৃষি উপকরণ বিক্রি করে এমন কোম্পানীগুলোকে ভর্তুকি এবং ঋণ সুবিধা দেয়া শুরু হয়।

শুরুতে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল আকর্ষণীয়ভাবে এবং কৃষকেরা উৎপাদনের পরিমাণ দেখে প্রকৃতই আকর্ষিত হয়েছিল। কিন্তু বেশ কিছু বছর পরেই উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমশ: হ্রাস পেতে শুরু করে। তখন দেখা যায় যে, শুধুমাত্র সার, বিষ প্রয়োগ করে নয়, উৎপাদন বৃদ্ধির পেছনে আরও অন্যান্য যেসব কারণ কাজ করেছে তার মধ্যে আছে - পতিত জমি চাষের আওতায় নিয়ে আসা, জঙ্গল কেটে চাষের জমিতে পরিণত করা, ডাল শস্য ও তৈলবীজের এলাকায় বদলে দানাশস্য চাষ করা, বোরো ধানের চাষের

এলাকা বৃদ্ধি করা, আদর্শ পরিবেশ উপযোগী বীজ ব্যবহার করা এবং সেচের আওতায় জমি নিয়ে আসা ।[৩৮]

"সবুজ বিপ্লব" এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ । তাই এর চাষযোগ্য শস্য হচ্ছে একক দানাশস্য ফসল যেমন গম, ধান । প্রথম দিককার উৎপাদনের পরিমাণ দেখে কৃষকরা ক্রমশ: এই একক দানাশস্য চাষের দিকে ঝুঁকে পড়ে । ধান ছাড়াও আরও যেসব সহযোগী শস্য, সবজি, তেলবীজ, ডাল চাষ হতো সেসব কমে গিয়ে বাংলাদেশে শুধুমাত্র ধানের চাষ বৃদ্ধি পায় । সেই সঙ্গে গমের চাষ শুরু হয়, যা কিনা এই এলাকায় ছিল খুব কম আকারে । বর্তমানে ভূট্টার চাষ শুরু হয়ে ক্রমশ: বৃদ্ধি পাচ্ছে । এর ফলে আমাদের দেশে যে বিভিন্ন খাদ্যাভাস ও ফসল বৈচিত্র্য ছিল যেমন, কাউনের ধান, যবের ছাতু, মুড়ির ধান, খই এর ধান, পিঠার ধান, পূজা-পার্বনের ধান, জুমচাষের ধান, এবং বিভিন্ন ধরনের আলু, শস্য, বীজ, পাতা শাক এসব ক্রমশ: হারিয়ে যেতে থাকে । পাশ্চাত্য কৃষির উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের ফলে কৃষক খাদ্য চাহিদা ভিত্তিক খাদ্য উৎপাদন বাদ দিয়ে বাণিজ্যিক কৃষিতে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে ।

সবুজ বিপ্লবের বা রাসায়নিক কৃষির প্রবক্তা যারা তারা শস্যের উৎপাদনকে যেভাবে সামনে ফোকাস করেছিল, তেমনিভাবে এর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া এবং অন্তর্নিহিত ক্ষতির দিকগুলোকে এড়িয়ে গিয়েছিল । এমনকি উৎপাদন যে ক্রমশ: কমতে থাকবে এটাও উহ্য রেখেছিল । তাই রাসায়নিক কৃষির প্রবর্তনের চল্লিশ দশক পর এর ক্ষতিকর দিকগুলো এখন আমাদের সামনে প্রকাশিত হচ্ছে এবং যে গভীরতর ক্ষতির সম্মুখীন আমাদের ভূ-প্রকৃতি, জীববৈচিত্র্য, কৃষি এবং কৃষক সমাজ হয়েছে তাকে উত্তরণ করা কঠিন হয়ে দাড়াবে । এক সমীক্ষায় দেখা গেছে ফসল উৎপাদনশীলতা কমেছে যথাক্রমে ধানে ১২.৪%, সরিষায় ১৬.৪%, গমে ১০.৯%, আলুতে ৮.২% ও অন্যান্য ৩৮.৮% ।[৩৯]

সবুজ বিপ্লব উত্তর প্রতিক্রিয়া

জমিতে এবং শস্যে রাসায়নিক সার, বীজ এবং কীটনাশক বিষ, বালাইনাশক ব্যবহারের ফলে এর প্রতিক্রিয়াগুলো এখন আমাদের সামনে স্পষ্ট । মাত্রাতিরিক্ত সার, বিষ ব্যবহারের ফলে জমিতে, ফসলে শত্রু পোকার প্রতিরোধ শক্তি ক্রমশ: বৃদ্ধি পেয়েছে । ২০ বছর আগে যে পরিমাণ বিষ ফসলে ব্যবহারের ফলে ফসলের পোকামাকড় প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছিল, বর্তমানে তার দ্বিগুণ, তিনগুণ পরিমাণ বিষ ফসলের ক্ষেতে প্রয়োগ করা হচ্ছে । অন্যদিকে ধানের ক্ষেত্রে সেচ নির্ভর বোরো ধান চাষ করার ফলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ক্রমশ: নিচে নেমে যাচ্ছে । সেই সাথে মাটির নিচের খনিজ পানি উপরের দূষিত পানির সংস্পর্শে চলে আসছে ।[৪০]

একটা সময় ছিল যখন কিনা ধান চাষের ক্ষেত্রে আমাদের বলতে হতো যে, ধানের প্রধান ফসল হচ্ছে আমন ধান । আউশ, আমন, বোরো- এই তিন সময়ের ধানের মধ্যে কৃষক প্রধানত: তার সারা বছরের খাবারের জন্যে আমন ধানের উপর নির্ভর করত । যে ধান বৃষ্টির পানি তথা ভূ-পৃষ্ঠের উপরের স্তরের পানির সাহায্যে চাষ করা হতো এবং যে পানির উৎস নদ- নদী, খাল-বিল এবং বৃষ্টির পানি । কিন্তু সবুজ বিপ্লবের ফলে এই ধারণা বদলে গেছে । এখন ধানের প্রধান আবাদ বোরো । যা কিনা উচ্চ ফলনশীল, হাইব্রীড বীজ, সেচের পানি এবং কীটনাশক বিষের উপর নির্ভরশীল । এবং যা সবকিছুই অর্থের বিনিময়ে পেতে হয় ।

একথা আজ সর্বজন বিদিত। অথচ সবুজ বিপ্লবের আগে কৃষকের ঘরে বীজ, সার ছিল। সেচের জন্য প্রকৃতির পানি ছিল, যার কোন কিছুই কিনতে হতো না। কীট দমনের জন্য ছাই এবং অন্যান্য জৈব পদ্ধতি ছিল। এর ফলে যা হচ্ছে তা হলো- অতিরিক্ত বিষ, রাসায়নিক সারের ব্যবহার। যা কিনা মানব স্বাস্থ্যের জন্য ভীষণ রকমের ক্ষতিকর।

রাসায়নিক কৃষির ফলে নষ্ট হচ্ছে মাটি এবং মাটির মধ্যে থাকা বিভিন্ন অনুজীব। যেসকল হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ অনুজীব মাটিতে মিশে আছে, যারা কিনা গাছের জন্য খাবার তৈরি করে থাকে, সেইসব অনুজীব রাসায়নিক সার এবং বিষের প্রভাবে বিনষ্ট হয়ে মাটির গুণাগুণকে হ্রাস করে দেয়।

রাসায়নিক পদ্ধতির কৃষি তথা আধুনিক কৃষি আদিবাসীদের জন্য কী প্রতিক্রিয়া নিয়ে এসেছে?

বাংলাদেশের সমতল ভূমির কৃষি মূলত: হাল চাষ এবং সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে হয়ে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে তথা পার্বত্য এলাকায় চাষাবাদের প্রধান উপায় ছিল "জুমচাষের" মাধ্যমে চাষ। অন্যদিকে মধুপুর এলাকার গারো জনগোষ্ঠীর একমাত্র জীবিকা ছিল কৃষি কাজ এবং তারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মত যাযাবর প্রকৃতির কৃষি ব্যবস্থায় অভ্যস্ত ছিল। অনেক সময় জঙ্গল কেটে আবাদও একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল। জুম চাষে এক এলাকায় একবার ফসল করার পর তাকে পতিত হিসেবে ফেলে রাখা হতো। এভাবে ফেলে রাখার মাধ্যমে জমিকে পুনরায় উর্বর অবস্থায় নিয়ে আসা হতো। বাংলাদেশের মধুপুর এলাকার গারো জনগোষ্ঠী এই ধরনের চাষে অভ্যস্ত ছিল। যেখানে তারা পাহাড়ী ধান বাদেও স্থানীয় জাতের অনেক প্রজাতির ধান চাষ করত। মধুপুর এলাকা একেবারে সমতল ভূমি নয়, আবার পার্বত্য চট্টগ্রামের মত পাহাড়ও এই এলাকার ভূ-প্রকৃতির মধ্যে নেই। ফলে এখানকার নৃ-গোষ্ঠী গারোরা পূর্বে আমন ধান এবং জুম চাষ করত।[৪১] আবার পরবর্তীতে সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী সার, বিষ ও বীজ কোম্পানির উচ্চ ফলনশীল জাত চাষাবাদ আরম্ভ করে। স্থানীয়ভাবে বাঙালীদের আবাস শুরু হবার পর আমন ধান চাষ শুরু হয়। অথচ মধুপুরের গারো জনগোষ্ঠী একসময় শুধু জুম চাষই করত। আর জুম চাষের প্রধান ফসল ছিল বিভিন্ন জাতের গারো ধান, কাউন, ভূট্টা, তুলা, বরবটি এবং অন্যান্য স্থানীয় জাতের ফসল। কিন্তু এখন যা চাষ হয় তা বাংলাদেশের অন্যান্য সমতল এলাকার চাষাবাদের মতই উফসি জাত বা হাইব্রীড জাতের ফসল।[৪২]

খাদ্য ও কৃষিতে ব্যবহৃত উদ্ভিদ, প্রাণী এবং অনুজীবের জাত এবং জাতের ভিন্নতাই এক অর্থে কৃষি-জীববৈচিত্র্য বা কৃষি-প্রতিবেশ। জীববৈচিত্র্যে বিভিন্ন জাতের পশুপাখি, কীট-পতঙ্গ, উদ্ভিদ, মাটি, পানি এবং মানুষ সবকিছুর সমাহারকে বুঝায়। কারণ এদের প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের বেঁচে থাকার বা টিকে থাকার সম্পর্ক রয়েছে, রয়েছে খাদ্য-খাদক সম্পর্ক। পৃথিবীতে একসময় মানুষ আশি হাজার উদ্ভিদ প্রজাতি থেকে নিজেদের বৈচিত্র্যময় খাবার তৈরি করত। কিন্তু বর্তমানে হাতে গোনা মাত্র ৩০টি উদ্ভিদ প্রজাতি থেকে মোট খাদ্য সামগ্রীর ৯৫% তৈরি হচ্ছে। ১৯০০ সালের পর থেকেই পৃথিবীর অগণিত ফসলের জাতের ৭৫% বিলুপ্ত হয়ে যাবার সাথে সাথে হারিয়ে গেছে খাদ্য বৈচিত্র্য[৪৩]। এই হারিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রধানত মানুষই মূল ভূমিকা পালন করেছে। মানুষই তার চারপাশের পরিবেশকে পরিবর্তিত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে।

বাংলাদেশে আধুনিক কৃষির প্রবর্তনের ফলে চাষকৃত জমির ব্যবহারজনিত দিকটি আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠে। আগে কোন মাটিতে কী ফসল ভাল হতে পারে সে ব্যাপারে যথেষ্ট জ্ঞান কৃষকদের সামনে

উপস্থাপিত হতো এ কথা বলা যায় না। কিন্তু বর্তমানে প্রযুক্তিগত সুযোগ-সুবিধা এবং জ্ঞান সুলভ হবার কারণে ফসল রীতিতে পরিবর্তন হচ্ছে। একটি দীর্ঘমেয়াদী গবেষণায় দেখা যায় যে, ১৯৮৮ সালে মোট চাষকৃত জমির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ছিল দো-আঁশ মাটি এবং প্রায় এক-চতুর্থাংশ এঁটেল মাটি দ্বারা গঠিত। কিন্তু ২০০৪ সাল নাগাদ চাষকৃত জমির প্রায় ৩৫ শতাংশ দখল করে বেলে দোআঁশ মাটিযুক্ত জমি, যা আগে ছিল ২২ শতাংশ। এই পরিবর্তন ইঙ্গিত করে যে কৃষক বর্তমানে বাজার চাহিদার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন প্রকার জমিতে বিভিন্ন ফসল উৎপাদনে নিবিষ্ট থাকছে।[৪৪]

আব্দুল বায়েস এবং মাহবুব হোসেন এর লেখাতে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, ১৯৮৮ সালেও নির্দিষ্ট গবেষণা এলাকায় মোট চাষকৃত জমির অর্ধেকের বেশি দখল করে ছিল সনাতন আমন ধান। তারপরই প্রাধান্য ছিল আউশ ধানের। যার আওতায় ছিল প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জমি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, অতীতে প্রায় চার-পঞ্চমাংশ চাষকৃত জমি শুধুমাত্র সনাতন বা ঐতিহ্যবাহী ধান উৎপাদনে ব্যবহৃত হতো। সেই সময় উফসী ধানের প্রচলন ছিল, কিন্তু এই ধান উৎপাদনে প্রধান উপাদান পানির প্রাপ্যতা ছিল কম। সে কারণে কৃষক উফসী চাষ করতে সক্ষম হতো না। তখন উফসী বোরো এবং আমন ধানের আওতায় জমির অংশ ছিল গড়পড়তা এক-পঞ্চমাংশের নিচে।[৪৫]

কিন্তু সময়ের ব্যবধানে বিষয়টি পুরো উল্টোদিকে ঘুরে গেল। খুব দ্রুত উফসী বোরো ধানের চাষ বেড়ে গেল এবং চাষকৃত জমির পরিমাণ বেড়ে গেল তিনগুণ। সনাতন আউশ ধানের চাষ এখন নেই বললেই চলে। মোটামুটিভাবে বলা যায় ১৯৮৮-২০০৪ সময় এই দেশে আধুনিক ধানের চাষের স্বর্ণকাল বিবেচিত হতে পারে।

তবে উন্নয়নের আকাশে কালো মেঘের ইঙ্গিত নিয়ে আসে আধুনিক ধান চাষের সমালোচকদের অব্যাহত সমালোচনা। সমালোচকরা মনে করেন, আধুনিক ধান চাষের জোয়ারে পূর্বেকার ধান বহির্ভূত অনেক ফসল উৎপাদনে ভাটা পড়েছে। অধিক মুনাফা তাড়িত হয়ে কৃষক এখন শুধু ধান চাষই করছে, অন্যান্য ফসলের দিকে তেমন মনযোগী হচ্ছে না। সেই কারণে বহুমুখী ফসল বিন্যাস থেকে একমুখী ফসল বিন্যাসের দিকে ধাবিত হচ্ছে। যার ফলে ডাল চাষ ক্রমশঃ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ১৯৮৮ সালে মোট চাষকৃত জমির এক-দশমাংশ ছিল ডাল চাষের জমি, ২০০৪ সালে তা হয়ে যায় তার অর্ধেক। এভাবেই তেলবীজসহ অন্যান্য সব ফসল বাদ পড়ে যায় এককভাবে ধানের কাছে।[৪৬]

এর দুটি প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে। এক. এই যুক্তি উল্লেখ্য যে, জমিতে একই ধরনের ফসল উৎপাদন জমির উৎপাদিকা শক্তি ব্যাহত করে এবং অন্যদিকে বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন জমির উৎপাদিকা শক্তির ভারসাম্য রক্ষায় অবদান রাখে। দুই. আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সুষম খাদ্যের জন্য ডাল ও ভাত উভয়ই প্রয়োজন। ধানের ক্রমবর্ধমান উৎপাদন যেমন চালের দাম কমিয়ে দিচ্ছে, অন্যদিকে ডাল উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমশ: কমছে। যার ফলে ডালের দাম বেড়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ ফসলের বহুমুখীতা যেমন ব্যহত হচ্ছে তেমনি ব্যহত হচ্ছে খাদ্যে বহুমুখীতা। এর থেকে উত্তরণের পথ খোঁজাটা জরুরী।

চারপাশের পরিবেশকে পরিবর্তনের জন্যে মানুষ প্রযুক্তির উদ্ভব ঘটিয়েছে। আঠারো শতকের শেষে যুক্তরাজ্যে শিল্প বিপ্লব ঘটে। কয়লার জ্বালানি শক্তিকে রুপান্তরিত করা হয় বাস্পের শক্তিতে। সেই শক্তির

জোরে চলতে লাগলো কলকারখানা, রেলগাড়ি। কয়লার পর এল তেল এবং বিদ্যুতের শক্তি। বিভিন্ন আবিষ্কারের ফলে পৃথিবীতে পরিবর্তন হয়েছে এবং এসব পরিবর্তনের ফলে পৃথিবী মানুষের জন্য আরও বেশি বাসযোগ্য হয়েছে। পৃথিবীর জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাবার কারণে এখন এমন অবস্থায় এসেছে যে, প্রকৃতির সুষম পরস্পর নির্ভর ভারসাম্যে বিপর্যয় ঘটাতে আরম্ভ করেছে, যা পরিবেশের জন্যে ক্রমশ: হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এরই প্রেক্ষিতে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যাগুলোও আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এসবের মধ্যে প্রধান সমস্যাগুলো সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো।

১. জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঃ সারা পৃথিবীতেই আজ জনসংখ্যার বৃদ্ধি উদ্বেগজনক। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বনাঞ্চল এবং কৃষি জমি হ্রাস পাচ্ছে, যা পরিবেশের জন্যে হুমকিস্বরূপ।

২. শিল্পদূষণ ঃ পৃথিবীতে কলকারখানা বৃদ্ধির সাথে সাথে বেড়েছে চারপাশের পরিবেশ দুষণ। কলকারখানা বায়ুমন্ডলে ছড়িয়ে দিচ্ছে বিপুল পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড এর মত বিষাক্ত পদার্থ। এসব রাসায়নিক পদার্থ নদীর পানিতে মিশে নদীর পানিকে বিষাক্ত করে তুলছে। মৃত্যু ঘটাচ্ছে জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীদের এবং মাছেদের।

৩. বন বিনাশ ঃ মানুষ জ্বালানীর প্রয়োজনে, আসবাবপত্র তৈরিতে চিরকালই বনের গাছপালা কেটেছে নিষ্ঠুরভাবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এই বন ধ্বংসের পরিমাণও বেড়েছে। এককালে বনের গাছপালা কাটলে তা প্রাকৃতিক নিয়মেই পুনরুজ্জীবিত হত। কিন্তু বর্তমানে বিনাশের পরিমাণ এত বেশি যে, তা আর পূরণ করা সম্ভব হয়ে উঠে না। কমতে কমতে বর্তমানে বাংলাদেশে বনাঞ্চলের পরিমাণ হচ্ছে প্রায় ২৬,০০,০০০ (ছাব্বিশ লক্ষ) হেক্টর। দেশের মোট আয়তনের প্রায় ১৭.৬২% বনভূমি। বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনভূমির পরিমাণ প্রায় ষোলো লক্ষ হেক্টর, যা দেশের আয়তনের প্রায় ১০.৮৪%।[৪৭] এর ফলে ভূমিক্ষয় বৃদ্ধি পেয়েছে। বনাঞ্চলের পরিমাণ কমে আসায় জলবায়ুতে এর প্রভাব পড়েছে।

৪. বায়ুমন্ডলে ওজোন স্তরে ক্ষয় ঃ পৃথিবীর উঁচু বায়ুমন্ডলে 'ওজোন " নামে গ্যাসের একটা স্তর আছে। এটি সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি অনেকখানি পরিমাণ শুষে নিয়ে মানুষ ও অন্যান্য জীবকে রক্ষা করে। অথচ মানুষই নানারকম বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করছে, যা এই ওজোন স্তরকে ধ্বংস করে দেয়। যা পৃথিবীর অধিবাসীদের জন্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে।

৫. বিশ্বব্যাপী গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি ঃ বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বাড়ছে। খনিজ জ্বালানী পোড়ানোর ব্যাপকতা এবং বনজঙ্গল নিধনের মিলিত ফল হিসাবে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ছে।

৬. ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার ঃ বর্তমানে মানুষের জীবনে নানা ধরনের রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার বাড়ছে। কৃষিকাজে ফসলের উৎপাদন বাড়ানোর জন্যে ছড়ানো হচ্ছে রাসায়নিক সার, কীটনাশক, আগাছানাশক। যা বৃষ্টিতে ধুয়ে পানিতে মিশে যাচ্ছে এবং পানিকে দূষিত করছে। এমনকি কীটনাশক মানুষের শরীরেও প্রবেশ করছে। প্লাস্টিকের ব্যবহারে সারা বিশ্ব ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, কেননা তা দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। এসব প্লাস্টিক দ্রব্য ক্ষতিকর কৃত্রিম রাসায়নিক পদ্ধতিতে তৈরি হয়ে থাকে।

৭. জীব প্রজাতির বৈচিত্র্য হ্রাস ঃ পৃথিবীর ক্রমবিকাশের সময় লক্ষ কোটি বছরের। এই দীর্ঘদিনের ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে হাজার হাজার প্রকারের উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির উদ্ভব হয়েছে। এসব প্রজাতি আবার সবাই একের সঙ্গে অন্যে নানা রকম অচ্ছেদ্য সম্পর্কে জড়িত। অথচ আজ খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে গিয়ে মানুষ অল্প কিছু উচ্চ ফলনশীল প্রজাতির ফসলের উপর বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে এবং তাতে অন্য প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। বন বিনাশ, রাসায়নিক দুষণ এবং আরো অন্যান্য কারণে বহু উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির বিনাশ সাধন হচ্ছে। এতে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে বিপর্যয়ের আশংকা সামনে চলে আসছে। আমাদেরকে সচেতন হতে হবে এখনই।

বিজ্ঞানীরা বলে প্রায় শতকোটি বছর আগে পৃথিবীতে জীবনের বিকাশ ঘটেছিল। এককোষ ও বহুকোষ বিশিষ্ট উদ্ভিদ ও প্রাণীর যে অবশেষ পাওয়া গেছে দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ায় আবিষ্কৃত জীবাশ্মে, তা একে প্রমাণ করে।[৪৮]

পরিবেশ বিপন্ন হওয়া সম্পর্কে আমাদের সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে দুটো কারণে। প্রথমত: পৃথিবীতে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ও যান্ত্রিক সভ্যতার প্রাধান্য। দ্বিতীয়ত: প্রকৃতিকে গভীরভাবে আবিষ্কার ও উপলব্ধি করার মতন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও মানসিক চেতনার অগ্রগতি।

উদ্ভিদ, প্রাণী ও জড়জগৎ নিয়ে যে বাস্তুসংস্থা বা ইকোলজি, সেখানে মানুষও একটি উপাদান মাত্র অন্যান্য প্রাণীদের মতন। আদি পৃথিবীতে মানুষ যখন সংখ্যায় ছিল নগন্য এবং তাদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা ছিল না, ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য শিকার এবং সংগ্রহের উপর ছিল নির্ভরশীল, তখন পরিবেশের উপর তার তেমন কোন প্রভাব ছিল না। বাস্তুসংস্থা বা পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে অন্যসব প্রাণীদের মতই ছিল তার অস্তিত্ব, সেখানে মানুষের কোন প্রাধান্য বা আধিপত্য ছিল না। কিন্তু মানুষ যখন থেকে ভূমিচাষ শুরু করেছে, গাছ কেটে, আগুন জ্বেলে, গৃহ নির্মাণ করে গড়ে তুলেছে সভ্যতা, তখন থেকেই পরিবেশের উপর চাপ সৃষ্টি হতে শুরু করেছে।

শিল্প উৎপাদন ও প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারকে ভিত্তি করে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ব্যাপৃত মানুষ ক্রমশ: পরিবেশের উপর আধিপত্য প্রসারিত করেছে। এক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। যিনি বিজ্ঞানী তিনি প্রকৃতিকে আবিষ্কার করেছেন নিজস্ব সৃজনশীলতায় এবং উদ্ভাবন করেছেন প্রযুক্তি। কিন্তু বিজ্ঞানীর আবিষ্কারকে ব্যবহার করা হয়েছে ভিন্নভাবে, আধিপত্য প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার রূপে। প্রকৃতিকে উপলব্ধি করতে হবে, জেনে ভালবাসতে হবে– এই চেতনা বড়জোর বিজ্ঞানী বা শিল্পীর ব্যক্তিগত- এর সামাজিক প্রসারতা লাভ করেনি। পরিবেশ বিপন্ন হওয়ার সেটাও একটা কারণ। পরিবেশের প্রতি মানুষের রয়েছে দায়িত্বশীলতা। এ দায়িত্ব শৃংখলা রক্ষার, সমন্বয় সৃষ্টির। একটা ফুলকে সাজাতে হয় না, কিন্তু অনেকগুলো ফুল থাকলে তাকে সাজাতে হয়, এই সাজানোটা হচ্ছে শৃংখলা। আমাদের অনেকগুলো কাজ করতে হলে এবং সেগুলো যদি পরস্পর সম্পর্কিত হয় তাহলে সমন্বয়ের দরকার পড়ে। সৌরজগতের মধ্যে পৃথিবীর অবস্থান এবং এর বিদ্যমানতা, এর প্রকৃতি সবই একটি শৃংখলার মধ্যে, সমন্বয়ের মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু আমরা জেনেছি যে, মানুষের সৃষ্ট অতিরিক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড এর মত গ্রিনহাউস গ্যাসের বায়ুমন্ডলে নির্গমন পৃথিবীর জলবায়ুতে এক ধরনের সমন্বয়হীনতা তৈরি করছে। এর সঙ্গে কৃষিতে কীটনাশক বিষের ব্যবহার, রাসায়নিক পদার্থের ক্রমাগত ব্যবহার বৃদ্ধি আমাদের পরিবেশকে

বিপর্যস্ত ও বিপন্ন করছে, বিপন্ন করছে উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতকে। অনেক প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে, অনেক প্রজাতি হুমকির মুখে।

কিন্তু আমরা জানি যে, জ্ঞান-বিজ্ঞান যেমন প্রযুক্তির উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে পরিবেশকে বিপন্ন করে, সেই জ্ঞান-বিজ্ঞানই তেমনি নতুন উদ্ভাবনের মাধ্যমে পরিবেশের এই সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হতে আমাদেরকে সাহায্য করে থাকে। এই সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে বিজ্ঞানের গভীরতর জ্ঞানে, প্রযুক্তির মানবিক বিকাশে এবং উন্নততর সামাজিক চেতনায়।

কীটনাশকের ব্যবহার

বাংলাদেশের কৃষিতে কীটনাশকের ব্যবহার ক্রমশঃ মাত্রাতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৭০ সালে এর বার্ষিক ব্যবহার ছিল ১০০ টন, ১৯৯০ সালে তা হয়েছিল প্রায় ৩,০০০ টন, আর ২০১৬ সালে ছিল ১৪,২৬৬.১৪ মেট্রিক টন।[৪৯] এই ব্যাপক বৃদ্ধি কতটা প্রয়োজনীয় সেটা গবেষণার বিষয়। সার ও কীটনাশকের ব্যবহার ফসল উৎপাদনের বৃদ্ধিতে প্রভাব রেখেছে কিন্তু এর ফলে জীববৈচিত্র্যে যেসব সমস্যাগুলো সৃষ্টি হয়েছে তা দেখার বিষয়, এবং কীটনাশকের ব্যাপক প্রয়োগ সত্ত্বেও ফসলের শত্রু কীটদের বেঁচে থাকা এবং প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়া মনে প্রশ্ন জাগায় যে, এর অন্তর্নিহিত কারণগুলো কি? আমাদের অবস্থান এর বিরুদ্ধে নয়, কিন্তু ঢালাওভাবে সমর্থন না করে, কীভাবে এর মাধ্যমে উদ্‌ভূত সমস্যাগুলো উত্তরণ ঘটানো যায় তাকে খুঁজতে হবে। এ ব্যাপারে বহুজাতিক রাসায়নিক উপকরণ উৎপাদনকারী কোম্পানীগুলোর সাথে আমাদের দেশের নীতি-নির্ধারক ও ব্যবসায়ীদের মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়েও মনে প্রশ্ন জাগে।

সময়ের সাথে পথ পরিক্রমায় সবুজ বিপ্লবের মাধ্যমে চালু হওয়া এই রাসায়নিক নির্ভর আধুনিক কৃষির বেশ কিছু নেতিবাচক দিক আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। একথাগুলো আমরা আগেও বলেছি এবং বিভিন্ন জায়গায় লিখেছি। তারপরও আমাদের মনে হয়েছে যে, এই কথাগুলো আমাদের বার বার উচ্চারণ করতে হবে সমস্যাকে বোঝার জন্য, চিন্তা করার জন্য।[৫০] যেমন:

১. মাটির উর্বরতা ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে, ফলে আগের তুলনায় এখন অনেক বেশী রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হচ্ছে অথচ উৎপাদন ক্রমশ কমছে।

২. কীটনাশক বিষের ব্যবহার ক্রমশ বাড়ছে অথচ শত্রু পোকার সংখ্যা ও প্রভাব বেড়ে চলেছে।

৩. সেচের প্রয়োজনে ভূ-গর্ভস্থ পানি যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে পানির স্তর ক্রমশ নিচে চলে যাচ্ছে, পানির স্টক নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে, সেচের খরচ বেড়ে যাচ্ছে এবং অন্তত ৪২টি জেলায় পানিতে আর্সেনিক দূষণ বেড়ে যাচ্ছে।

৪. খাদ্য ও পানিতে এই রাসায়নিক বিষ মিশে যাচ্ছে, ফলে মানুষের স্বাস্থ্যহানি হচ্ছে এবং ক্যানসারের মত দুরারোগ্য ব্যাধিও বেড়ে চলেছে; মাতৃদুগ্ধেও এই বিষ মিশে যাচ্ছে এবং শিশুরাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

৫. চাষীর বন্ধু প্রাণীরা ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। অনেক পোকা, মাছ, সরিসৃপ, ব্যাঙ, পাখি এবং মাটিতে বসবাসকারী অনেক প্রাণী ইতোমধ্যেই লোপ পেয়ে গেছে।

৬. কৃষক বীজের জন্য বাজারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে গেছে । কৃষির যাবতীয় সরঞ্জাম (ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, পাম্প, কীটনাশক, ছত্রাকনাশক, আগাছানাশক, সার প্রভৃতি) এর জন্য কৃষক বিশেষ কিছু কোম্পানির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।

৭. একক শস্যের নিবিড় চাষের (মনোকালচার) ফলে শস্য বৈচিত্র্য হারিয়ে যাচ্ছে।

৮. কৃষির যাবতীয় পরম্পরাগত জ্ঞান হারিয়ে কৃষক কৃষি পদ্ধতির জন্য বিভিন্ন কোম্পানির উপর নির্ভরশীল হয়ে গেছে। যন্ত্রনির্ভরতা ও বাজার নির্ভরতার ফলে ঐতিহ্যবাহী কৃষি সরঞ্জাম (লাঙল, ঢেঁকি, জাঁতা, ঘানি প্রভৃতি) এবং বলদ ও মহিষের ব্যবহার লোপ পেয়ে যাচ্ছে।

৯. চাষের খরচ অনেক বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও রোজগার যথেষ্ট না হওয়ায় কৃষকরা কৃষিকাজের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলছে।

১০. কৃষি সংস্কৃতি ও স্থানীয় খাদ্য সংস্কৃতি হারিয়ে যাচ্ছে।

এছাড়াও উৎপাদন বৃদ্ধি করতে গিয়ে কৃষকরা প্রতিবেশের দিকে নজর দিচ্ছে না এবং পরিবেশবান্ধব চাষ পদ্ধতিগুলো ক্রমেই বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। সবাই খাদ্য শৃঙ্খলের কথা ভুলে গেছে, যেখানে একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। একজন মারা পড়লে অন্যের খাদ্যের অভাব ঘটবে; হারিয়ে যাবে প্রাণবৈচিত্র্য, পরিবেশ হবে বিপর্যস্ত। কৃষিকাজে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্যাদি যখন পানিতে মিশে তখন জলজ প্রাণীগুলো মারা যায় আর যে কৃষক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল ফলায় তারাও থাকে অরক্ষিত। এছাড়া ক্রমাগত রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ ও সেচের পানির গুণাগুণ না জেনে জমিতে দেয়ার ফলে অনুজীব, কেঁচো প্রভৃতি মারা যায় আর বিভিন্ন ধাতুর বিষক্রিয়ায় মাটি হারায় অতি মূল্যবান উর্বর শক্তি। সব মিলিয়ে আমাদের এগ্রোইকোলজি বা জীববৈচিত্র নির্ভর কৃষি আজ হুমকির মুখে। বর্তমান কৃষি শুধু উৎপাদনকেই গুরুত্ব দেয়। কারণ বলা হয়, উন্নয়নশীল দেশের মানুষকে খাওয়াতে হবে।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার গবেষণা প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, এখন পৃথিবীতে যে পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন হচ্ছে তা সকলের জন্য যথেষ্ট, তারপরও ৮১ কোটির বেশি মানুষ ক্ষুধার্ত থাকে। অন্যদিকে উৎপাদিত খাদ্যের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ নষ্ট হয়, যার পরিমাণ প্রায় ১.৩ বিলিয়ন টন।[৫১]

২০০৮ সালে বিশ্বব্যাংক ও জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের সহায়তায় বিগত কয়েক দশক ধরে চলা কৃষি উন্নয়নের অগ্রগতি ও ফলাফল বোঝার জন্যে একটি গবেষণা পরিচালনা করে। এই গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী[৫২] বিগত কয়েক দশকে কৃষিবিজ্ঞানের মূল চিন্তা ছিল নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করা, যার ফলে কৃষি উৎপাদন কয়েক গুণ বেড়েছে। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলোর দরিদ্র মানুষেরা, যারা এই উৎপাদন বৃদ্ধি সত্ত্বেও সবচেয়ে কম লাভবান হয়েছে, তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোর সমাধান হয়নি। বর্তমানে পৃথিবীতে একদিকে যেমন অসম উন্নয়ন হচ্ছে, অন্যদিকে দারিদ্র্য

ও অপুষ্টিজনিত সমস্যাগুলো থেকেই যাচ্ছে। প্রতিবেদনে স্থানীয় ইকোসিস্টেম ও সংস্কৃতি টিকিয়ে রেখে সেই অনুযায়ী বৈচিত্র্যপূর্ণ চাষাবাদের মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জন এবং পরিবেশের অবক্ষয় রোধ করে সমতাভিত্তিক উন্নয়ন ও সুস্থায়ীত্বের ব্যাপারে সুপারিশ করা হয়। তাই পৃথিবীব্যাপী কৃষিবিজ্ঞানী, পরিবেশবিজ্ঞানীরা একটি সামগ্রিক পদ্ধতি হিসাবে জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষিকে মুক্তির পথ হিসেবে সুপারিশ করেছেন।

এতসব সমস্যার মধ্যেও নতুন ইতিবাচক শক্তি জন্ম নেয়। যা কিনা গণতন্ত্র, মানবিক অধিকার, সামাজিক এবং পরিবেশগত ন্যায়বিচারের চেতনা। পরিবেশ রক্ষার আন্দোলন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে। জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বিশ্ব সম্মেলন হচ্ছে । ১৯৯২ সালের ব্রাজিলের রিও শহরে অনুষ্ঠিত হয় ধরিত্রী সম্মেলন। এসময় বিজ্ঞানীরা দেখান যে বায়ুমন্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে গেছে। এর ফলে পৃথিবী গরম হয়ে যাচ্ছে, যাকে 'জলবায়ু পরিবর্তন' বলা হয়। এছাড়া পৃথিবীর জীববৈচিত্র্য দ্রুত বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এবং ভূমিক্ষয় ত্বরান্বিত হয়েছে। তাই বিশ্বনেতারা পৃথিবীকে মানুষের বসবাসের উপযোগী রাখার তাগিদে ৩টি মূল্যবান চুক্তি করে : ১. জলবায়ু কনভেনশন বা ইউএনএফসিসিসি, ২. জীববৈচিত্র্য কনভেশন এবং ৩. ভূমিক্ষয় কনভেনশন।

কর্পোরেট পুঁজিবাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে যেমন তার আগ্রাসন বৃদ্ধি পাচ্ছে অন্যদিকে কর্পোরেট সাম্রাজ্যের ভিতর থেকেই তার বিরুদ্ধ মতবাদের শক্তি জন্ম নিচ্ছে। এই রকম প্রতিকুল পরিবেশেও মানব চেতনা এগিয়ে চলেছে। সেই কারণে রাসায়নিক নির্ভর উৎপাদনমুখী কৃষির বিপরীতে জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষির কথা সামনে এগিয়ে আসছে।

বৃক্ষ যে পরিবেশ ভারসাম্য বজায় রাখে তাকে মানুষ একসময় নড়বড়ে করে দেয় বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহারে, শিল্প উৎপাদনের মাধ্যমে পরিবেশ মানুষের জন্য হুমকি হয়ে দাড়ায়। তাই সচেতন মানুষের চিন্তা ভাবনায় নতুন করে গুরুত্ব পেতে হবে উদ্ভিদ, বৃক্ষ, পরিবেশ।

"বৃক্ষের সৃষ্টি না হলে পৃথিবীতে অন্য কোন প্রাণী বা প্রাণ সম্বলিত কোন জীবের সৃষ্টি সম্ভব হত না। এই বৃক্ষের জন্যই মানুষসহ যতো জীব জানোয়ারের বসতি গড়ে উঠেছে সারা পৃথিবীতে। আর মানুষের জীবনতো বৃক্ষ নির্ভর জীবন। যেখানে বৃক্ষ নেই, সেখানে জল নেই, প্রাণী নেই, মানুষ নেই। বৃক্ষ মানুষের বেঁচে থাকার মত পরিবেশ সৃষ্টি করে। বৃক্ষকে অবলম্বন করেই মানুষ বেঁচে থাকে, বেঁচে থাকবে। সৃষ্টি থেকেই তাই বৃক্ষের সাথে মানুষের সম্বন্ধ।"[৫৩]

সচেতনায়ন প্রক্রিয়া, গণগবেষণা আলোচনা

৫. নারী ও প্রতিবেশ

পরিবেশ হল ভূপৃষ্ঠ থেকে ওজোন স্তর পর্যন্ত প্রাণী ও উদ্ভিদ, জীব ও জড় সবকিছুর সমষ্টি। মানবজাতির বাইরে এসবের অস্তিত্বকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই নীতিগতভাবে মূল্যায়ন করা হয়না। কিন্তু প্রকৃতিতে সব কিছুরই একটা মূল্য রয়েছে। মানুষ শ্রেষ্ঠ, এই ধারণা থেকেই পরিবেশের ক্ষতি করা হচ্ছে। পরিবেশের যে একটি নিজস্ব মূল্য রয়েছে, তা নিয়ে গড়ে উঠেছে পরিবেশবাদ। প্রকৃতির প্রতি সম্মান দেখানো হল এর ভিত্তি। মানব প্রজাতির শ্রেষ্ঠতায় বিশ্বাসীরা মনে করে যে, পরিবেশ হচ্ছে তাদের সহায়ক বা অধস্তন সত্তা। আর সে কারণেই মানুষ প্রকৃতির প্রতি সহিংস আচরণ করে থাকে, তারা মনে করে প্রকৃতি মানুষের জন্যই সৃষ্ট। পরিবেশের প্রতিটি সত্তাই গুরুত্বপূর্ণ, তা মানবসত্তা বা যে কোন সত্তাই হোক।

পরিবেশকে প্রচলিত মূল্যবোধ এতকাল সংকীর্ণ দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করেছে এবং পরিবেশের যে নিজস্ব মূল্য আছে তাকে অস্বীকার করেছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের এই বোধ প্রকৃতিকে যেমন তেমনি নারীর শ্রেষ্ঠত্ব

বা মূল্যকে উপেক্ষা করেছে । আধুনিক দর্শনে যুক্তিবাদী দার্শনিকেরা যুক্তিবুদ্ধি এবং আবেগ অনুভূতিকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন এবং বিপরীত বিষয় ও ব্যক্তিগত বিষয় বলে মনে করেন এবং এসবকে গুরুত্বহীনভাবে দেখা হয় । এই অনুসারে নারীর আবেগ অনুভুতিকেও অনির্ভরযোগ্য মনে করা হয় । ফলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীর নৈতিক কর্তব্য চেতনাকে মূল্যহীন বলে অস্বীকার করে থাকে, নারী সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করা হয় না । মূল্যবোধ এমনভাবে নির্মিত হয়েছে যে, তা কেবল পুরুষের লক্ষ্যকেই জোরদার করেছে, স্তরায়নের মাধ্যমে সমাজ নারীর চেতনাকে নিম্নস্তরে ঠাঁই দিয়েছে ।[৫৪]

প্রকৃতি ও নারীকে সমান্তরালভাবে দেখা হয়ে থাকে বর্তমান সমাজ মূল্যবোধে । সে সাথে লিঙ্গভিত্তিক শ্রমবিভাজন নারীকে প্রকৃতি নির্ভর করে তুলেছে এবং সহজাতভাবে নারীকে পরিবেশের ব্যবস্থাপক করে দিয়েছে । মূলত নারী, পরিবেশ ও টেকসই উন্নয়নের ধারণা থেকে জন্ম নিয়েছে পরিবেশ নারীবাদ (ইকো ফেমিনিজম)[৫৫] যা পরিবেশের প্রেক্ষিতে নারী ও পুরুষকে বিবেচনা করে থাকে । এই ধারণার পথিকৃত মারিয়া মাইজ, রোজ ব্রাইদোত্তি এবং বন্দনা শিবা-র মত পরিবেশ নারীবাদীরা । যারা কিনা পরিবেশের প্রেক্ষিতে নারী ও পুরুষের অবস্থানকে বিশ্লেষণ করে থাকে । পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রকৃতি যেমন তাদের সহায়ক অবস্থানে রেখেছে, নারীকেও সেভাবে দেখে থাকে । যেখানে নারীকে তাদের অধস্তন অবস্থানে দেখা হয়ে থাকে । প্রকৃতিকে যেভাবে লাঞ্ছিত করা হয়, একইভাবে নারীকেও সেভাবে অবমাননা করা হয় - দৈহিকভাবে এবং মানসিকভাবে । প্রকৃতি ও পুরুষের সম্পর্ক যেমন অসম তেমনি নারীর সাথেও পুরুষের সম্পর্ক অসম । প্রকৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে যেমন তাকে সম্মান করা প্রয়োজন, সমাজকে টিকে থাকতে হলে তেমনি নারীকেও সম্মান করা প্রয়োজন । পরিবেশ নারীবাদীরা এ নিয়েই কাজ করেন । তাই প্রকৃতিকে সম্মান করার মাধ্যমে নারীর প্রতি সম্মান- এই ডিসকোর্স প্রচলিত করতে হবে ।

সাঁওতাল, মুন্ডা, বাগদীদের মত আদিবাসী নারীরাও প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল । পরিবেশ বিপর্যয় ও দূষণের ফলে প্রতিবেশ আজ বিপন্ন, যার প্রত্যক্ষ শিকার এইসব নারীরা অরক্ষিত হয়ে যাচ্ছে । কৃষি ও পরিবেশ প্রকৃতি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নারীর লোকজ জ্ঞান ছিল একসময় তাদের সম্পদ । কিন্তু বর্তমানে কৃষির ব্যবস্থাপনার পরিবর্তনের কারণে নারীদের অবস্থান প্রান্তিকে পরিণত হয়েছে । গৃহের পরিসরে যেখানে নারী জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষির মাধ্যমে এবং নিজেদের সংরক্ষিত বীজের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন করত এবং স্বনির্ভর ছিল, সেখানে সবুজ বিপ্লব কুঠারাঘাত করেছে । বিনিময়ে কর্পোরেট গোষ্ঠীর প্রাধান্যকে সামনে এনে দিয়েছে । যে গোষ্ঠী শুধুই মুনাফার কথা ভাবে, প্রকৃতিকে সম্মান দেয় না । সমাজের প্রবল মতাদর্শ আধিপত্যশীল, এটা বৈশ্বিক পরিসরেও । তাই কর্পোরেট গোষ্ঠী কৃষক বলতে শুধুমাত্র জমির মালিক পুরুষকেই বুঝে থাকে ।

এ থেকে উত্তরণের জন্য দরকার জেণ্ডার উপযোগী স্পেস তৈরী করা । নারীদেরকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলা এবং অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতায় নারীদের কাজের সুযোগ বৃদ্ধি করা । শুধুমাত্র নারীদের সমবায় বা স্বনির্ভর গোষ্ঠী গড়ে তোলা । নারী নেতৃত্ব সৃষ্টি করা, জেন্ডার আলোকিত শিক্ষণ প্রক্রিয়া প্রবর্তন করা । কৃষিতে, জীববৈচিত্র্য রক্ষায় এবং সুস্থায়ী পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা ও এর অন্তর্নিহিত কারণগুলো তুলে ধরা । এক্ষেত্রে গণগবেষণা পদ্ধতির চর্চা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে ।

বলা হয় তথ্য হচ্ছে ক্ষমতা। নারীর ক্ষমতায়নের জন্যে তথ্যের রয়েছে যৌক্তিক সম্পর্ক। রাষ্ট্রীয় সেবা এবং কাজের সুযোগ বৃদ্ধির জন্যে এ সম্পর্কিত তথ্য জানা জরুরী, বাংলাদেশের 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' সেক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে।[৫৬]

তবে জ্ঞানচর্চা হচ্ছে অন্যতম হাতিয়ার সকল প্রতিরোধকে মোকাবেলা করার জন্যে আর সেক্ষেত্রে শিক্ষণ প্রক্রিয়া জরুরী। অংশগ্রহণমূলকভাবে এবং হাতে কলমে শেখার মাধ্যমে জ্ঞান চর্চা বর্তমান বাংলাদেশের বাস্তবতায় জরুরী। সমাজের প্রবল মতাদর্শ প্রবল কারণ তাদের জ্ঞানচর্চার হার বেশি। সঠিক জ্ঞানচর্চা পরিবেশ ও নারীকে উন্নত অবস্থানে নিয়ে যেতে সহায়ক বলে মনে করা হয়। সেই সাথে পরিবেশ সুরক্ষায় নারীর কাজকে সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্মান প্রদর্শন করা হলে প্রকৃতিকে সম্মান করা হবে বলে আমার বিশ্বাস। প্রকৃতিকে সম্মান করার মধ্য দিয়েই প্রকৃতপক্ষে মানবজাতির অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব হবে।

স্থানীয় জাতের বিভিন্ন ঔষধি গাছের ফার্ম

৬. কী করণীয় এবং কী করছি

দীর্ঘদিনের ক্রমবিকাশের মধ্যে দিয়ে লক্ষ ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির উদ্ভব ঘটেছে আমাদের চারপাশের পরিবেশে। এসব প্রজাতি আবার সবাই একের সঙ্গে অন্যে নানা অচ্ছেদ্য সম্পর্কে বাঁধা। অথচ আজ খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে গিয়ে মানুষ অল্প কিছু উচ্চ ফলনশীল প্রজাতির উপর বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে, অন্য সব প্রজাতি তাতে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এতে পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হয়ে এক বড় চরম পরিবেশগত বিপর্যয়ের আশংকা দেখা দিচ্ছে, মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ছে। তাই আমাদের কৃষি প্রতিবেশ নিয়ে গভীরভাবে ভাববার সময় এসেছে।

প্রকৃতপক্ষে আমাদের কৃষি ব্যবস্থা এমন হতে হবে যাতে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবের সাথে মোকাবেলা করতে পারে, প্রতিবেশবান্ধব হয়, কৃষকের স্বার্থ ও জনস্বাস্থ্য গুরুত্ব পায়। এরকম সুস্থায়ী কৃষি

সম্ভব দুভাবে: ১. ইকোলোজিকাল রেজিলেন্স বৃদ্ধির মাধ্যমে; ২. কমিউনিটি বা সামাজিক বন্ধনকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে। জীববৈচিত্র্য নির্ভর চাষাবাদ পদ্ধতি এই দুইটি বৈশিষ্ট্যকেই ধারণ করে। তাই রিইব কৃষক, কৃষি-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও নীতি-নির্ধারকদের সাথে জীববৈচিত্র্যের প্রসারে কাজ করছে। কারণ খাদ্য সার্বভৌমত্ব ও প্রতিবেশের সুরক্ষা, প্রান্তিক কৃষকদের উৎপাদন অব্যাহত রাখা এবং টিকে থাকার জন্যে এগ্রো-ইকোলজির চর্চাকে গুরুত্ব দিয়ে সামনে নিয়ে আসা প্রয়োজন।

অতিরিক্ত বালাই, কৃষিপণ্যের উচ্চমূল্য, শস্যহানি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মাধ্যমে পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে জীববৈচিত্র্য ভালভাবে খাপ খায়, যেখানে ভূমি, মাটি ও ফসল উৎপাদনে সহায়ক এবং বছরের পর বছর তা অব্যাহত থাকে। এগ্রোইকোলজি খাদ্যসার্বভৌমত্ব ও খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কিত মানুষের অধিকারকে প্রাধান্য দেয় যা বেঁচে থাকার জন্য অত্যাবশ্যক।

এগ্রোইকোলজি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দীর্ঘ সময় ধরে প্রান্তিক চাষীদের বিভিন্ন উপায়ে আয় করার জন্য সমাধান দেয়। এগ্রোইকোলজি শুধু পরিবেশকেই ভাল রাখেনা, সাথে সাথে কৃষকের আয় বৃদ্ধি ও সুস্বাস্থ্য আনয়নে অবদান রাখে।

কী করণীয়

রাসায়নিক কীটনাশকের পরিবেশ দূষণের কথা বিবেচনা করে এই বিষয়ে সারা বিশ্বব্যাপী সমন্বিত কীট দমন পদ্ধতির প্রচলন হয়েছিল। তবে এ বিষয়ে আরও সফলতা পেতে হলে ক্ষতিকর কীটদের উপর গবেষণা এবং তাদের প্রাকৃতিক শত্রুদের উপর গবেষণা করা জরুরী।[৫৭] আমাদের দেশের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায় এমন সকল গাছ-গাছড়া ও উদ্ভিদের মধ্যে কিছু সংখ্যক বাদে বাদ বাকী সকলের কীটনাশক গুণাবলীর একটি পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক সমীক্ষা আজ অবধি তেমনভাবে হয়নি।[৫৮] এ বিষয়ে গভীর গবেষণা চালানো হলে অনেক কার্যকর প্রাকৃতিক উপাদান পাওয়া যেতে পারে বলে অনুমিত হয়।

কীট এবং কৃষির দ্বন্দ্ব নিরন্তর। একদিকে জনগোষ্ঠীর খাদ্য চাহিদার যোগান দেওয়া, অন্য দিকে পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখার প্রশ্ন। দূষণমুক্ত কীট দমন পদ্ধতির উদ্ভাবন এবং এর উন্নয়নই হচ্ছে প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন জাতীয় চেতনা সৃষ্টি করা।

চেতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে কার্যকর কর্মপন্থা নির্ধারণ এবং কর্ম উদ্দীপনা সৃষ্টি করা। গবেষণা করে দেখা উচিৎ যে কীটনাশকের ব্যবহারের ফলে কতটা ক্ষতি সাধন হয়েছে। এ বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ের মৌলিক গবেষণা করা প্রয়োজন। সামগ্রিক অবস্থার উপর বস্তুনিষ্ঠ তীক্ষ্ম নজর রাখা জরুরী। যা করার এখনই শুরু করা দরকার। আর এই শুরুটা কৃষকদের মাধ্যমেই করা যেতে পারে। কারণ কৃষকরা প্রত্যক্ষভাবে এই সমস্যার সাথে জড়িত, তাদের জীবন-জীবিকা, ভবিষ্যৎ সবকিছু এই সুতোয় বাঁধা। এই সমস্যার সমাধানে কৃষকের ভেতর থেকে যেমন তেমনি বাইরে থেকেও কাজ করতে হবে। এক্ষেত্রে পূর্বসূরী হিসেবে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাচেতনা আমাদের সহায়ক হতে পারে। আর কৃষকদের মাঝে জ্ঞান সঞ্চারণে পথিকৃত পাওলো ফ্রেইরীর ভাবাদর্শ আমাদের চেতনাকে বাস্তবে কাজে লাগাতে সহায়ক হতে পারে। এখানে এঁদের দুজনের চিন্তা এবং কাজের কিছু দিক তুলে ধরা হল।

রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও চেতনায় কৃষি, কৃষক সমাজ ও গ্রাম জীবন নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে। তিনি সাহিত্যে গ্রামজীবনের দেখা-কে রূপায়িত করেছেন। একইসাথে গ্রামজীবনের দু:খ দুর্দশাকে হ্রাস করে একটি

আলোকোজ্জল জীবনের স্বপ্ন বাস্তবায়নে কাজ করেছেন। তিনি গ্রামীণ অর্থনীতির ভিতরে নিহিত শক্তিকে পুনরুদ্ধার করে গ্রামকে স্বনির্ভর করে তুলতে চেয়েছেন সমবায়ের ভিত্তিতে। সমবায় ছিল তাঁর সকল কাজের ভিত্তি। তিনি বুঝেছিলেন গ্রামের উন্নতির মাঝেই নিহিত রয়েছে বাংলাদেশের সমৃদ্ধি। গ্রামের অধিকাংশ মানুষ যেহেতু কৃষিজীবী তাই কৃষির উন্নতির মাধ্যমেই দেশের উন্নতি হতে পারে বলে তাঁর ধারণা। কৃষির উন্নতি বলতে তিনি শুধু কৃষির ফলন/ উৎপাদন বৃদ্ধি বোঝেন নি, তিনি চেয়েছিলেন উন্নতির মানে কৃষকের হাতে অর্থ আসুক, যার মাধ্যমে সে উন্নতির দিকে যেতে পারে। তিনি মধ্যস্বত্বভোগীদের আধিপত্য হ্রাস করার জন্য কৃষি সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। সেই সাথে পল্লী সংগঠন এবং সমবায়ের মাধ্যমে অর্থনৈতিক মুক্তির ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যে কৃষককে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তা ফুটে উঠেছে সোনার তরী কাব্যে-

সোনার ক্ষেতে কৃষাণ বসিয়া
কাটিতেছে পাকা ধান
ছোট ছোট তরী পাল তুলে যায়
মাঝি বসে গায় গান।

অথবা
আমরা চাষ করি আনন্দে
মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল হতে সন্ধে
রৌদ্র ওঠে, বৃষ্টি পড়ে, বাঁশের বনে পাতা নড়ে
বাতাস মাঠে ভরে ভরা মাটির গন্ধে

রবীন্দ্রনাথ তার সমবায় চিন্তার প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন তাঁরই প্রতিষ্ঠিত শ্রীনিকেতন আশ্রমে। লিওনার্ড এলমহার্স্ট কেমব্রিজে ইতিহাস এবং আমেরিকায় কৃষি বিষয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। নিউইয়র্কে রবীন্দ্রনাথের সাথে তাঁর আলাপ আলোচনা হয় এবং তিনি রবীন্দ্রনাথের সাথে কাজ করতে রাজী হন। এরপর এলমহার্স্ট বোলপুরে চলে আসেন রবীন্দ্রনাথের সাথে কাজ করার জন্য। অত:পর শ্রীনিকেতন গড়ে ওঠে তার পরিশ্রম ও পরিকল্পনার মাধ্যমে।

এই শ্রীনিকেতন অনেকটা রাশিয়ার কৃষিভবনের আদলে গড়ে উঠেছিল। শ্রীনিকেতনের কৃষি কেন্দ্রের মূল কাজ ছিল প্রশিক্ষণ, কৃষি সম্প্রসারণ এবং কৃষি বিষয়ে নানা পরীক্ষা- নিরীক্ষা। তিনি এক নতুন ধারা সংযোজন করেছিলেন এই গ্রামোন্নয়নে, যার মূলে ছিল কৃষি সম্প্রসারণ ও সমবায়। সেই সাথে তিনি প্রবর্তন করেছিলেন কৃষি মেলার। "হলকর্ষণ" এবং "বৃক্ষরোপণ" উৎসব ছিল কৃষি উন্নয়নে রবীন্দ্রনাথের একটি বড় অবদান।

শ্রীনিকেতনের কর্মকান্ডে কৃষি প্রাধান্য পেলেও রবীন্দ্রনাথ এর সাথে যুক্ত করেছিলেন শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সমাজ সচেতনতা। তিনি সামাজিক পল্লী উন্নয়নের কথা ভেবেছিলেন এবং একে একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন হিসেবে গণ্য করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কৃষির পাশাপাশি শিল্পকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন

এবং শ্রীনিকেতনে শিল্প ভবন গড়ে তুলেছিলেন। তিনি জানতেন যে, শুধুমাত্র কৃষির উপর নির্ভর করে উন্নয়ন সম্ভব নয়।[৫৯]

শ্রীনিকেতনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল সমবায় প্রথা। তাঁর "স্বদেশী সমাজ"[৬০] প্রবন্ধে তিনি উন্নয়নের জন্য সমবায়ের কথা বলেন এবং ১৯০৫ সালে কালীগ্রাম পরগনার পতিসরে প্রতিষ্ঠা করেন "পতিসর কৃষি ব্যাংক"। এখানেই তিনি ১৯১৩ সালের নোবেল পুরস্কারের সকল অর্থ বিনিয়োগ করেন।

রবীন্দ্রনাথ কৃষিতে পরিবর্তন আনতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। এজন্য তিনি জামাতা নগেন্দ্রনাথ এবং পুত্র রথীন্দ্রনাথকে বিদেশ থেকে কৃষি বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষায় শিক্ষিত করে শিলাইদহে কৃষি উন্নয়নের কাজে নিয়োজিত করেন। পরবর্তীকালে শ্রীনিকেতনে তাঁর চিন্তা সফলতা লাভ করেছিল। সমবায়ের ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তা এমন ছিল, গ্রামের লোকজনকে বাইরে থেকে সাহায্য করা হবে না, তার শক্তির উৎস সে নিজের মধ্যেই আবিস্কার করে নেবে এবং আপন শক্তির উপর তাকে নির্ভর করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথের ধারণায় ছিল, কৃষককে বাঁচাতে হলে সমবায় প্রথা একান্ত প্রয়োজন। তিনি লিখেছেন, "আমাদের দেশে, আমাদের পল্লীতে ধান উৎপাদন ও পরিচালনার কাজে সমবায় নীতি অপরিহার্য।"[৬১] এই উদ্দেশ্যে তিনি শিলাইদহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিকে একত্রিত করে সমবায়ের মাধ্যমে ফসল উৎপাদনের কাজে হাত দিয়েছিলেন, কৃষি ব্যাংক বসিয়েছিলেন। কারণ তিনি অনুধাবন করেছিলেন যে, কৃষক ও কৃষির উন্নতি ব্যতীত পল্লী উন্নয়ন সম্ভব নয়। সেই সাথে সমবায়ের মাধ্যমে জোতদার, বিভিন্ন পেশাজীবী এবং রায়তদের একত্রিত হয়ে জোটবদ্ধ হতে প্রাণিত করেছিলেন। সমবায়ের ক্ষেত্রে আত্মশক্তির প্রতি রবীন্দ্রনাথ দৃঢ় আসক্তি দেখিয়েছেন। তাঁর মতে-

"চাষীকে আত্মশক্তিতে দৃঢ় করে তুলতে হবে, এই ছিল আমার অভিপ্রায়। এ সম্বন্ধে দুটো কথা সর্বদাই আমার মনে আন্দোলিত হয়েছে- জমির স্বত্ব ন্যায়ত জমিদারের নয়- সে চাষীর। দ্বিতীয়ত, সমবায় নীতি অনুসারে চাষের ক্ষেত্রে একত্র করে চাষ না করতে পারলে কৃষির উন্নতি হতেই পারে না।[৬২]

রবীন্দ্রনাথের পল্লী উন্নয়ন তথা কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নের ভাবনার ক্ষেত্রে ছিল তার স্বাদেশিকতা। তিনি সমাজের মধ্যেকার বৈষম্যকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন- জমিদার ও কৃষকের সম্পর্ককে অনুধাবন করেছিলেন। উপনিবেশিকতার ফলে সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক বৈষম্য তাঁর কাছে স্পষ্ট ছিল। তিনি এর পরিবর্তন চেয়েছিলেন এবং তা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। কারণ তিনি দেখেছিলেন যে, জমিদারী প্রথার মাধ্যমে গ্রামীণ সম্পদ শোষণ করা হচ্ছে এবং তা চলে যাচ্ছে বিদেশীদের কাছে। গ্রামের উদ্বৃত্ত সম্পদ গ্রামে না থেকে বাইরে চলে যাচ্ছে। গ্রামের বিত্তশালী ব্যক্তিরা গ্রাম ছেড়ে শহরে পাড়ি দিচ্ছে এবং গ্রাম নেতৃত্ব শুন্য হয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে চাষের জমি ক্রমশ: টুকরো হচ্ছে, জমিতে আইলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর উত্তরণে সমবায় ব্যবস্থাকে সমাধান মনে করেছিলেন তিনি। এই সমবায় সমাজের সকল শ্রেণী, পেশার মানুষের মিলনের এবং বাঁধনের। তখন উন্নয়নে কোন বাধা থাকে না, তা আসবে স্বাভাবিকভাবে।

রবীন্দ্রনাথ গ্রামের ঐক্যের জন্য সামষ্টিকতার বোধ সামনে নিয়ে এসেছিলেন। সম্পদের মধ্যেকার যে বৈষম্য যার ভিত্তি ধর্ম, সমাজ ব্যবস্থা, সামাজিক স্তর বিন্যাস, অর্থ-বিত্ত। ঔপনিবেশিকতা একে আরও

শক্তিশালী করেছিল এবং এর ফলে মানুষের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি হয়েছিল । তিনি এই বিচ্ছিন্নতাকে দূর করার কথা বলেছেন ।

“জোতদার ও চাষা রায়ত যতদিন প্রত্যেকে স্বতন্ত্র থাকিয়া চাষাবাদ করিবে, ততদিন তাহাদের অস্বচ্ছল অবস্থা কিছুতেই ঘুচিবেনা । পৃথিবীতে চারিদিকে সকলেই জোট বাঁধিয়া প্রবল হইয়া উঠিতেছে । এমন অবস্থায় যাহারাই বিচ্ছিন্ন এককভাবে থাকিবে, তাহাদিগকে চিরদিনই অন্যের গোলামী ও মজুরী করিয়া মরিতে হইবে । অদ্যকার দিনে যাহার যতটুকু ক্ষমতা আছে সমস্ত একত্রে মিলাইয়া বাঁধ বাধিবার সময় আসিয়াছে ।[৬৩]

নিজস্বতা, স্বাদেশিকতা গ্রামের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন । সেই সাথে নিজেদের যা আছে, যা সম্পদ আছে তার যথাযোগ্য ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নতি সম্ভব । “পল্লীবাসীরাই একত্রে মিলিলে যে সকল যন্ত্রের ব্যবহার সম্ভবপর হয় তাহারই সাহায্যে স্বস্থানেই কর্মের উন্নতি করিতে পারিলেই সকল দিক রক্ষা করা যাইতে পারে ।” কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে রবীন্দ্রনাথের এই প্রচেষ্টার মূলে ছিল প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর গভীর বিশ্বাস ।

রবীন্দ্রনাথ অনুধাবন করেছিলেন যে, উন্নয়নের জন্যে শিক্ষা জরুরী । শিক্ষা মানুষের আত্মবোধকে জাগ্রত করে, যা পরবর্তীতে আত্মশক্তিতে রূপান্তরিত হয় । অর্থনৈতিক উন্নয়ন মানুষকে বিত্তবান করে ঠিকই কিন্তু কেবলমাত্র বিত্ত মানুষকে শান্তি দানে সক্ষম নয়, এর জন্যে প্রয়োজন সুশিক্ষাভিত্তিক উন্নয়ন । রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা অর্থে প্রচলিত শিক্ষাকে বোঝেন নি, তিনি সমাজের “লোকশিক্ষা” যা সমাজে আবহমানকাল ধরে প্রচলিত তাকে বুঝেছেন । রবীন্দ্রনাথের মর্মমূলে এই চেতনাই সক্রিয় ছিল ।

পাওলো ফ্রেইরি-র ‘সচেতনায়ন’[৬৫] (কনশিয়েনটাইজেশন) প্রত্যয় শিক্ষণ প্রক্রিয়ার একটি অন্যতম দিক । এই প্রত্যয় নানান দেশের তৃণমূল জনগোষ্ঠী নিয়ে যারা কাজ করেন তারা ব্যবহার করে থাকেন । এই প্রত্যয় নিপীড়িত জনগণকে তাদের জীবন পরিবর্তনের প্রচেষ্টার কান্ডারী হতে উজ্জীবিত করে । সেই সাথে চায় জনগণ সমাজ বিশ্লেষণে সমালোচনামূলক হবে এবং আত্মানুসন্ধান করবে এবং সমাজ কাঠামো বদলে উদ্যোগ নেবে । উদ্যোগ নেবে রিফ্লেকশন-একশন-রিফ্লেকশন পদ্ধতিতে অর্থাৎ প্র্যাকসিস-এর মাধ্যমে । ফ্রেইরি এটি গণশিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন ।

Paulo Freire চিন্তা করেছিলেন যে মানুষ সমাজের বাস্তবতাকে বুঝতে পারবে আনুষ্ঠানিক জ্ঞান নয়, বরং সামষ্টিক নিজস্ব বিশ্লেষণের মাধ্যমে এবং তারা বুঝতে পারবে নিজেদের বাস্তবতায় । তাদের নিজ উদ্যোগের দ্বারা তারা নিজেরাই পরিবর্তন আনতে পারবে । এটি তাদেরকে নতুনতর উদ্যোগ নিতে উৎসাহ দেবে ।

এই দুই বিদ্বৎ জনের চিন্তা ও কাজের আদর্শকে ধারণ করে রিইব কাজ করছে কৃষকদের সাথে । এগ্রোইকোলজি বা জীববৈচিত্র নির্ভর কৃষি সংক্রান্ত জ্ঞান অন্বেষণ এবং কৃষক জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি করা শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে । কৃষি-প্রতিবেশ-এর ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে এর সাথে সম্পৃক্ত কৃষকদের জ্ঞানের বিকাশের প্রেক্ষিতে । পদ্ধতি হিসাবে “গণগবেষণা বা PAR তত্ত্ব (Participatory Action Research) গ্রহণ করা হয়েছে ।[৬৬]

গবেষণার একটি পদ্ধতি হিসেবে “গণগবেষণা” ব্যবহৃত হয়ে আসছে । অরল্যান্ডো ফালস বোর্দা ১৯৭০-এর দশকে পার্টিসিপেটরী একশন রিসার্চ বা গণগবেষণাকে উন্নয়নশীল দেশের জন্য তাত্ত্বিকভাবে চিন্তা ও অনুশীলন করেছেন । গণগবেষণার মূল ধারণাটি হল চিন্তাশক্তি ও জ্ঞানের দিক দিয়ে কোন শ্রেণীই

কোন শ্রেণীর চাইতে 'অগ্রসর' নয় । বাস্তবে যা ঘটে তা হচ্ছে দৈনন্দিন জীবনের সংগ্রামের কারণে কারও চিন্তা করার অবকাশ বেশী কারও কম । কেউবা বেঁচে থাকার জন্য স্থানীয় ক্ষমতাবান শ্রেণীর কাছে চিন্তা সমর্পন করেন । এরকম সময়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীরা সাধারণ মানুষের চোখে 'বুদ্ধিবৃত্তিক' শ্রেণী বলে বিবেচিত হয় । ফলে, অনেকে বিশ্বাস করতে শুরু করে যে শিক্ষিতদের মত চিন্তার ক্ষমতা তাদের নেই এবং তারা শিক্ষিত শ্রেণীর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে । তবে, তার মানে এই নয় যে তাদের চিন্তার ক্ষমতা লোপ পেয়েছে, বরং হয়তো সেটার ধার কমেছে মাত্র ।৬৭

গণগবেষণার একটি প্রধান লক্ষ্য সাধারণ মানুষের মরচে ধরা চিন্তাশক্তিকে আবার শাণিত করা যাতে তারা গভীর সমাজ বিশ্লেষণে নিয়োজিত হন । যাতে তারা নিজস্ব যৌথ সমাজ বিশ্লেষণ দ্বারা পরিচালিত হয়ে নিজেদের জীবনের অবস্থার উন্নতির যৌথ প্রচেষ্টায় লিপ্ত হন এবং এই প্রচেষ্টার অভিজ্ঞতা আবার যৌথ ভাবে বিশেষণ করে নিজেদের বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান উন্নত করেন এবং সেই উন্নত জ্ঞানের আলোকে আবার নতুন কর্মপন্থা গ্রহণ করেন । এককথায় শ্রমজীবিদের নিজস্ব প্রাক্সিস চালু করাই এর মূল লক্ষ্য ।

গণগবেষণার ক্ষেত্রেও ফ্রেইরির এই তত্ত্ব প্রভাব রেখেছে । যেখানে জনগণকে সরাসরি সমাজ গবেষণায় প্রণোদিত হতে সাহায্য করে আত্মসচেতনায়নের মাধ্যমে । রিইব-এর কাজে এর প্রতিফলন ঘটেছে কৃষকদের গণগবেষণা দল গঠন করা এবং বিভিন্ন নিজস্ব সমাজ ভাবনাগুলো অন্যদের মাঝে শেয়ার করার মাধ্যমে । রিইব-এর প্রকল্পে প্রণীত গণগবেষণা পদ্ধতি একটা কার্যকরী কৃষি শিক্ষণ (pedgogy) পদ্ধতি এটা প্রমাণিত হয়েছে । রিইব গ্রামীণ কৃষকদের উদ্যোগে তাদের নিজস্ব ছোট খামারে লোকজ এবং স্থানীয় বীজ, অর্গানিক সার, কীটনাশক ব্যবহার পদ্ধতি এবং নিজস্ব ব্যবস্থাপনার চর্চা করছে এই গণগবেষণা পদ্ধতির মাধ্যমে ।

তত্ত্বগতভাবে ঐতিহ্যকে ধারণ করে বাস্তবে তার প্রয়োগ সহজ কাজ নয় । কিন্তু চেষ্টা করে যেতে হবে । কারণ আমাদের বিশ্বাসে আছে যে, পরিবর্তনের জন্যে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়, এবং একদিন তা শেষ হয় ।

গণগবেষণা দলের সদস্যদের জৈবকৃষি বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান চর্চা

কৃষি জমিতে মই দেওয়া

৭. ভবিষ্যৎ ভাবনা ও উপসংহার

কৃষকরা পৃথিবীর শতকরা ৭০% মানুষের খাদ্যের যোগানদাতা এবং কৃষক এই খাদ্য উৎপাদন করে ২৫% বা তারও কম সম্পদ ব্যবহার করে- যার মধ্যে আছে জমি, পানি এবং কয়লার ব্যবহার। অন্যদিকে শিল্প ভিত্তিক খাদ্য উৎপাদনে ব্যয় হয় বিশ্বব্যাপী কৃষি সম্পদের ৭৫%। এছাড়াও এই আধুনিক চাষাবাদ গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গমনের কারণ হয়ে দাড়াচ্ছে। সেই সাথে এই আধুনিক কালের কৃষি সারা বিশ্বের মাত্র ৩০% নাগরিকের চাহিদা মিটিয়ে থাকে।[৬৮]

দারিদ্র্য সীমার নীচে পৃথিবীতে ৩৯% জনগণ বসবাস করে। কারণ শিল্পভিত্তিক খাদ্য সংস্থা ব্যয়বহুল এবং প্রায় ৭০ বছর ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছে- কিন্তু জনগণকে খাদ্য যোগান দানের ক্ষেত্রে উত্তরণ ঘটাতে পারছে না।

কৃষকের খাদ্যজালে জীববৈচিত্র্য বজায় রেখে চাষাবাদ করা হয়ে থাকে। যেখানে শস্যের বৈচিত্র্য বজায় রাখা হয় কৃষকের নিজস্ব জ্ঞানের মাধ্যমে। উদ্দীপক, সৃষ্টিশীল শক্তির ব্যবহার জলবায়ুর উপযোগী, এবং এই সব কৃষক অপুষ্টি এবং ক্ষুধার মধ্যে দিয়ে যায়।

জনগোষ্ঠীর খাদ্যের যোগান দেবে কে? গৃহস্থ কৃষক নাকি খাদ্য শিল্প?

একটা বিতর্ক প্রায়শ:ই সামনে চলে আসে এবং এ নিয়ে যথেষ্ট লেখালিখিও হচ্ছে যে, কে এই বিশ্বের আপামর জনগোষ্ঠীর খাদ্য চাহিদার যোগান দেবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষক গোষ্ঠীর খাদ্য ব্যবস্থা (Peasant food web) নাকি কর্পোরেট বা শিল্পজাত খাদ্য ব্যবস্থা বা শৃংখল (industrial food chain)। বিতর্ক নিয়ে লেখা বই "Who will feed us? The Peasant food web vs. The Industrial Food Chain"-এ একটি তুলনামুলক আলোচনা করা হয়েছে।[৬৯]

Peasant food web ধারণাটি মূলত যেসব ক্ষুদ্র কৃষক নিজের খোরাকী মিটিয়েও বাজারের জন্যে এবং জনগোষ্ঠীর অন্যান্য অংশের জন্য খাদ্য উৎপাদন ও যোগান দিয়ে থাকে। এখানে কৃষক অর্থে জেলে, কৃষক, শিকারী, গৃহস্থালী পশুপালনকারী, নারী কৃষক সকলকেই বুঝিয়েছে। Peasant food web এর সঙ্গে যুক্ত এগ্রোইকোলজি, অর্গানিক ফার্মিং, পারমাকালচার বা এ ধরনের যে কোন প্রাকৃতিক উৎপাদন ব্যবস্থা। এখানে খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, খাদ্য সার্বভৌমত্বের প্রশ্নটি সেভাবে নয়। অন্যদিকে Industrial Food Chain বলতে শিল্পায়নের মাধ্যমে মূলত খাদ্য উৎপাদন ইনপুট থেকে খাদ্য গ্রহণ আউটপুট পর্যন্ত শৃংখলকে বোঝায়। এই চেইনের প্রথম লিংকটি হচ্ছে শস্য এবং গৃহপালিত পশুপাখির জিনগত দিক, এর সাথে যুক্ত কীটনাশক, পশুপাখির ঔষধ, সার এবং ফার্ম এর মেশিনপত্র। যেখান থেকে চেইন এগিয়ে যায় যোগাযোগ ও গুদামজাতকরণ, মিলিং, প্রসেসিং এবং প্যাকেজিং-এ। চেইনের সর্বশেষ হচ্ছে পাইকারি, খুচরা বিক্রি এবং হোটেলে বা ঘরে পৌছে দেওয়া।

কৃষকদের খাদ্য ব্যবস্থা (Peasant food web): ক্ষুদ্র বা গৃহস্থ কৃষক, জেলে বা মৎস্যজীবি, পশুপালক, শিকারী, উৎপাদক, ক্ষেতমজুর, প্রকৃতিজীবি কর্তৃক উৎপাদন, উদ্বৃত্ব বিনিময় বা স্থানীয় বাজারে বিক্রি।

শিল্পজাত খাদ্য শৃঙ্খল (Industrial food chain): শিল্প কারখানায় উৎপাদিত ও কর্পোরেট নিয়ন্ত্রিত বীজ, কৃষি উপকরণ, যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে উৎপাদন এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিবহন, গুদামজাতকরণ, পাইকারী ও খুচরা বিক্রি।

ইটিসি গ্রুপের হিসাব অনুযায়ী পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭০ শতাংশ (৭৫০ কোটির মধ্যে ৪৫০-৫৫০ কোটি) প্রয়োজনীয় অধিকাংশ খাদ্যের জন্য সরাসরি কৃষকদের (Peasant food web) উপর নির্ভরশীল। বাকি ৩০ শতাংশ মানুষ নির্ভরশীল কর্পোরেট বা শিল্পজাত কৃষি/খাদ্য ব্যবস্থা বা শৃঙ্খলের (Industrial food chain) উপর। শিল্প-কারখানাজাত উৎপাদিত খাদ্যের মোট ক্যালরির ৭৬ শতাংশ খাবারের থালায় আসার আগেই নষ্ট হয়ে যায়, আর মাত্র ২৪ শতাংশ ক্যালরি মানুষ খেতে পারে। প্রতি বছর শিল্প খাদ্য শৃঙ্খলের উৎপাদিত ৪০০ কোটি খাদ্যের ৩৩-৫০% শৃঙ্খলের মধ্যেই নষ্ট হয়।

অন্যদিকে কৃষকরা যেখানে মোট কৃষিজমির মাত্র ২৫%, কৃষিতে ব্যবহৃত জীবাশ্ম শক্তির ১০% এবং কৃষিতে ব্যবহৃত মোট পানির ২০%-এর কম ব্যবহার করে ৭০% মানুষের খাদ্য যোগায়, সেখানে শিল্পজাত কৃষি ব্যবস্থায় মোট কৃষি জমির ৭৫%, ৯০% জীবাশ্ম শক্তি এবং ৮০% পানি ব্যবহার করা হয়। গুয়াতেমালা, বলিভিয়া এবং ব্রাজিলে সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, অরণ্য বা বনভূমি রক্ষার ক্ষেত্রে আদিবাসী জনগোষ্ঠী সরকারের চেয়ে ৬-২২ গুণ বেশি কার্যকরী ভূমিকা রাখেন।

বিভিন্ন দেশের কৃষকরা এখন পর্যন্ত ৭ হাজার প্রজতির উদ্ভিদের প্রায় ২১ লক্ষ জাত লালন করে আসছেন। অন্যদিকে বাণিজ্যিক ব্রিডাররা কাজ করেন ১৩৭টি ফসলের প্রজাতি নিয়ে, যার মধ্যে মাত্র ১৬টি শস্য থেকে খাদ্য উৎপাদনের ৮৬% আসে। শুধুমাত্র ভূট্টা নিয়ে গবেষণার জন্যই বেসরকারি বরাদ্দের ৪৫% অর্থ ব্যয় করা হয়। শিল্পজাত বাণিজ্যিক ব্রিডিং অনেক ব্যয়বহুলও, যেমন একটি জিএম জাত বাজারজাত করতে খরচ হয় প্রায় ১৩.৬ কোটি মার্কিন ডলার। কৃষকরা যেসব উদ্ভিদ প্রজাতি লালন করেন তার মধ্যে অনেকগুলোই অপ্রধান শস্য, যেগুলো দেশের প্রতিবেশ ব্যবস্থা বা ইকোসিস্টেমের জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি আপদকালীন বা দুর্ভিক্ষের সময়ের জন্যও খুবই প্রয়োজনীয়। এসব শস্যের খবর বিভিন্ন জরিপ বা পরিসংখ্যানে প্রায় আসেই না।

কৃষকরা প্রায় ৩৪ প্রজাতির পশু-পাখিকে পোষ মানিয়েছেন (domesticated) এবং এসবের ৮,৭৭৪টির বেশি জাত তাদের বাড়িতে লালন করছেন। আর শিল্পজাত খাদ্য শৃঙ্খল কাজ করছে ৫ প্রজাতির পশু-পাখি (গরু, মুরগী, শুকর, ভেড়া ও ছাগল) এবং এগুলোর ১০০টিরও কম জাত নিয়ে। কৃষকদের জাতগুলোর রোগ ও অন্যান্য বালাই প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক বেশি, যেখানে প্রতি বছর প্রায় ২,৪০০ কোটি মার্কিন ডলারের ঔষধ বিক্রি হয় শিল্পজাত পশু-পাখি পালনের জন্য। মাত্র ১০টি কোম্পানি এই ঔষধের বাজারের ৮৩% নিয়ন্ত্রণ করে। আর এখন 'এন্টিবায়োটিক-প্রতিরোধী' হয়ে যাওয়ার সমস্যাও ভয়ঙ্করভাবে দেখা দিচ্ছে।

জেলেরা মিঠাপানির ১৫,০০০ ও সামুদ্রিক ২০,০০০ প্রজাতির মাছ ধরেন। আর শিল্পজাত খাদ্য শৃঙ্খলে ১,৬০০ প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ ধরা হয় (যার ৪০% হচ্ছে মাত্র ২৩ প্রজাতির) এবং ৫০০ প্রজাতির মাছ চাষ করা হয় (প্রধানত ২৫টি প্রজাতি)। শিল্পজাত খাদ্য শৃঙ্খল কম প্রজাতির মাছ ধরলেও, সেগুলো ব্যাপক পরিমাণে ধরার ফলে সামুদ্রিক প্রতিবেশ ব্যবস্থায় এর ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। ১২০ বছর আগে জেলেরা এক ঘন্টায় যত মাছ ধরতে পারত এখন তার মাত্র ৬% ধরা পড়ে, যদিও মাছ ধরার অনেক নতুন প্রযুক্তি কাজে লাগানো হচ্ছে।

কৃষকদের প্রজনন করানো (breeding) বিপুল সংখ্যক শস্য ও গবাদিপশু-পাখির প্রজাতির অজস্র জাতবৈচিত্র্য খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার জন্য সহায়ক। বৈচিত্র্যময় স্থানীয় উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রজাতির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করেই জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষিকাজ করা হয়। কিন্তু ১৯৬১ সাল থেকে শিল্পজাত খাদ্য শৃঙ্খল নিয়ন্ত্রিত বাজারে ৩৬% প্রজাতি হারিয়ে গেছে। আর প্রজাতিগুলোর ৭৫% জাতবৈচিত্র্য কৃষকের খামার থেকে হারিয়ে গেছে। এসব হারিয়ে যাওয়া প্রজাতি ও প্রজাতির জাতগুলো এখন খুব কম খামারেই পাওয়া যায়।

কৃষকরা যেখানে সাধারণত স্থানীয় বীজ, জৈব সার ও সুস্থায়ী প্রযুক্তি ব্যবহার করে ফসল ফলাতে পারেন, সেখানে শিল্পজাত খাদ্য শৃঙ্খল নির্ভর করে ৪,১০০ কোটি মার্কিন ডলার মূল্যের বাণিজ্যিক বীজ বাজারের উপর। এই বাজারের ৫৫% নিয়ন্ত্রণ করে ৩টি কোম্পানি: মনসান্টো, ডুপন্ট ও সিনজেনটা। শিল্পজাত কৃষি উপকরণ ব্যবহারের ফলে প্রতি বছর ৭,৫০০ টন মাটি নষ্ট হয়। বাৎসরিক সিনথেটিক বা রাসায়নিক সার বিক্রি হয় ১৭,৫০০ কোটি ডলারের, যার অর্ধেক শস্যের কাজে লাগে আর বাকি অর্ধেক নষ্ট হয়। এই সারের জন্য প্রতি ১ ডলার খরচ করার ফলে মাটি ও পরিবেশের ক্ষতি হয় ৪ ডলারেরও বেশি। রাসায়নিক সারের ৮০% দেয়া হয় মূলত গবাদিপশুর খাদ্য উৎপাদনের জন্য।

কৃষকদের খাদ্য ব্যবস্থাপনায় পরাগসংযোগকারী প্রায় ২০ হাজার প্রজাতির মৌমাছি, বিভিন্ন পোকা-মাকড়, পাখিরা বিচরণ করতে পারে। এসব পরাগসংযোগকারীরা পৃথিবীর প্রধান খাদ্য শস্যগুলো ৭৫%-এর পরাগায়ন ঘটায়। অন্যদিকে শিল্পজাত খাদ্য শৃঙ্খল এসব প্রাকৃতিক পরাগসংযোগকারী ও অনুজীব ধ্বংস করে। প্রয়োগ করা বালাইনাশকের মাত্র ১-৫% অভিষ্ট বালাই এর উপর কাজ করে, কিন্তু ইকোসিস্টেম ও আমাদের স্বাস্থ্যের ব্যাপক ক্ষতি করে দেয়।

পৃথিবীর মোট মিঠাপানির ব্যাবহারের ৭০% হয় কৃষিকাজের জন্য, যার অধিকাংশই শিল্প খাদ্য শৃঙ্খলে ব্যবহার করে সেচ, গবাদিপশু-পাখি পালন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য। শুধুমাত্র কোকাকোলা কোম্পানি যে পানি ব্যবহার করে (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে) তা ২০০ কোটি মানুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথেষ্ট। খাদ্য ব্যবস্থার বিশ্বায়নের মানে হচ্ছে একদেশের মানুষ যে খাবার খাচ্ছে তা হয়ত অন্য দেশের পানি ব্যবহার করে উৎপাদন করা হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ যুক্তরাজ্যের মানুষের খাদ্য উৎপাদন করতে যে পানি খরচ হয় তার ৭৫% পানিই অন্য দেশের। ধান ও ভুট্টা উৎপাদনে শিল্প খাদ্য শৃঙ্খলের চেয়ে কৃষক খাদ্য ব্যবস্থাপনায় যথাক্রমে ৯ ও ৩ গুণ শক্তি কম খরচ হয়। সব মিলিয়ে ১ কিলোক্যালরি খাদ্য শক্তি উৎপাদন করতে শিল্প খাদ্য শৃঙ্খল খরচ করে ১০ কিলোক্যালরি শক্তি, যেখানে কৃষকদের প্রয়োজন হয় ৪ কিলোক্যালরি শক্তি। বছরে একজন আমেরিকানের খাবারের জন্য ২ হাজার লিটার তেল খরচ হয়।

খাদ্য সংরক্ষণের যে পদ্ধতিগুলো আমরা দেখি সেগুলো সবই আদিবাসী জনগোষ্ঠী বা কৃষকদের উদ্ভাবিত, যেমন: শুকানো, লবণ মাখানো, আচার, গাঁজান ও শীতলীকরণ। কিন্তু শিল্প খাদ্য শৃঙ্খল খাদ্য সংরক্ষণের চেয়ে লাভজনক খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণে বেশি আগ্রহী। শুধুমাত্র আমেরিকায় শিল্প-খাদ্য প্রতিষ্ঠানগুলো ৩ হাজার ফুড-এডিটিভ (food additives) ব্যবহার করে, ৬০ বছর আগে যার সংখ্যা ছিল ৭০৪। খাবার গ্রহণ করার পরও এই এডিটিভগুলো অনুজীব মেরে ফেলতে থাকে, যার ফলে পেট ও পাকস্থলীর সমস্যা হতে পারে। খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের ফলে প্রচুর প্লাস্টিক অপচয় ও দূষণ হয়। এছাড়া এভাবে বাণিজ্যিক প্রক্রিয়াজাতকরণের ফলে স্থানীয় বাজার ব্যবস্থাপনা ও খাদ্য বৈচিত্র্য নষ্ট হয়ে যায় এবং অস্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণের প্রবণতা বাড়ে।

শিল্প খাদ্য শৃঙ্খল প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যকর পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবারের চেয়ে বেশি পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন করে। এর পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণে অস্বাস্থ্যকর ও ক্ষতিকর খাদ্যও উৎপাদন করে, যার ফলে পৃথিবীর ৩০% মানুষ এখন মেদ ও অতিরিক্ত ওজনের সমস্যায় ভুগছেন। শিল্পোন্নত দেশগুলোতে মেদ সমস্যার কারণে মানুষের গড় আয়ু প্রায় ১০ বছর কমে যাচ্ছে। এছাড়া এই শৃঙ্খলের ফলে খাদ্য বৈষম্যও তৈরি হয়েছে। যেমন আমেরিকানরা তাদের প্রয়োজনের চেয়ে ২৫% বেশি খাবার খায়।

সব মিলিয়ে ভোক্তারা খাদ্য ক্রয়ের বিনিময়ে প্রকৃতপক্ষে শৃঙ্খলকে পরিশোধ করে বছরে ১২.৩৭ ট্রিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে ৬৯% খরচ হয় বিপরীত-উৎপাদন খাতে (counter-productive), যার মধ্যে আছে নষ্ট হওয়া খাবারের মূল্য, অতিরিক্ত ভোগের দাম এবং সামাজিক-স্বাস্থ্যগত-পরিবেশগত ক্ষতির মূল্য।

এছাড়া এই শিল্প খাদ্য শৃঙ্খল একক বাজার সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে বাধা মনে করে। আর কৃষকরা এই সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও জ্ঞানকে উত্তরাধিকারসূত্রে লালন করে পরিবেশের সুস্থায়ীত্ব নিশ্চিত

করে। সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ খাদ্য উৎপাদন, গ্রহণ এবং পৃথিবীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে প্রভাবিত করে। অন্যদিকে শিল্প নিয়ন্ত্রিত মনোকালচার খাদ্য ব্যবস্থাপনা ভোক্তাদেরকে কৃষকদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, খাদ্যাভাস পালটে দেয়, এবং বৈচিত্র্য কমিয়ে দেয়। এই শৃঙ্খল সব জায়গায় একই রকম জীবন যাপন, উৎপাদন পদ্ধতি ও ভোগ চালু করতে চায়, যদিও জলবায়ু, বাসস্থানের অবস্থা ও জীবনযাত্রার উপর আমাদের পুষ্টি চাহিদা ভিন্ন হয়ে থাকে। সব মিলিয়ে বিভিন্ন ধরনের ভর্তুকি, সহযোগিতা গ্রহণের মাধ্যমে ৭০ বছর চেষ্টার পরও শিল্প খাদ্য শৃঙ্খল পৃথিবীর সব মানুষকে খাওয়াতে সক্ষম হয়নি। এই শৃঙ্খল এত জটিল ও ব্যয়বহুল যে এখনও ৩৯০ কোটি মানুষ ক্ষুধা বা অপুষ্টিতে ভুগছে।

প্রকৃতি এবং মানুষ জীবন ধারক তন্ত্রের (life support system) অবিচ্ছেদ্য অংশ। এর প্রধান পাঁচটি উপাদান হলো: বাতাস, পানি, মাটি, উদ্ভিদ ও প্রাণী। এরা একে অন্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একে অন্যের উপর নির্ভরশীল এবং বিবর্তনের ধারায় একই স্রোতে এরা প্রবাহিত। সে কারণে যে কোন একটির অবনতি হলে স্বাভাবিকভাবে তা অন্যগুলিকে প্রভাবিত করে।[৭০]

প্রকৃতির সাথেই সম্পর্কিত হতে হবে আমাদের। এ ধরনের চেতনা যদি আমাদের নিজেদের মধ্যে গড়ে তুলতে পারি তবেই আমরা প্রকৃতিকে রক্ষা করতে পারব, নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারব।

এতসব চ্যালেঞ্জ কৃষকদেরকে মোকাবেলা করতে হচ্ছে। এখান থেকে উত্তরণের উপায় কি? কারণ কৃষকদের মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া আছে যে, বর্তমান রাসায়নিক পদ্ধতির কৃষি না করলে আমাদের উৎপাদন কমে যাবে এবং খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়বে। ভয় কৌশলে ঢুকিয়ে দিয়েছে বহুজাতিক কোম্পানীগুলো। খাদ্য নিরাপত্তা কি শুধুই উৎপাদনের সাথে জড়িত নাকি এর সঙ্গে আরও বিষয় যুক্ত, তা জানতে হবে। তথ্যই ক্ষমতা। সেই তথ্যকে ব্যবহার করে বিদেশী সংস্থাগুলো কৃষক সমাজকে পরোক্ষে নিয়ন্ত্রণ করে। উৎপাদনহীনতার ভয় দেখিয়ে হাইব্রীড জাতের চাষ করতে প্রলুব্ধ করে, ফলশ্রুতিতে হারিয়ে যায় লোকজ বীজ। এসবই আমাদের দেশের কৃষকদের জন্যেও প্রযোজ্য।

উপসংহার

যদি কৃষির সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় কৃষি প্রতিবেশ প্রণয়ন করা যায় তাহলে এখানে সর্বোচ্চ অর্জন সম্ভব। বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে কৃষি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সেক্টর হিসেবে বিদ্যমান। গ্রামীণ জনগণের প্রতি বৈষম্যমূলক নীতিসমূহ অবশ্যই পুনর্নির্ধারণ করা উচিত এবং গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণ অনুমোদন করা উচিত। নীতি নির্ধারক, সরকারি এবং বেসরকারি সম্প্রসারণ কর্মীরা একত্রিতভাবে এবং শেয়ার করে কাজ করতে হবে এবং স্থানীয় নিজস্ব লোকজ পদ্ধতি ও জ্ঞান অবলম্বন করে চাষাবাদে নতুন বিকল্প পদ্ধতি খুঁজে বের করতে হবে। এই কর্মকান্ড বা আন্দোলন সকল শ্রেণির জনগোষ্ঠীকে একত্রিত করার মাধ্যমে করতে হবে। যেমন নারী, ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী এবং দলিত যারা অতীত কাল থেকে কৃষিকে অবলম্বন করে জীবনযাপন করছে, সময় এসেছে এই দিকে মনোযোগ দেবার।

কৃষি, কৃষক সমাজ এবং জীববৈচিত্র্য এসব শব্দ এবং এর সঙ্গে সম্পৃক্ততা তৈরি হয়ে গেছে বিশ্ব রাজনীতির এবং ইস্যুটি রাজনৈতিক। এই রাজনীতিকে বুঝতে হলে জ্ঞানের বিকাশ জরুরী। বর্তমান প্রযুক্তি নিয়ে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত সমাজ যেভাবে এগিয়েছে, কৃষকের অবস্থান সেখানে কোথায়? তাদের তো প্রাথমিক শিক্ষাই নেই, যা কিনা মৌলিক শিক্ষা। বৈশ্বিক পরিসরে এই জ্ঞানের অসমতা নিয়ে বাংলাদেশের কৃষি এবং কৃষক সমাজের সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া সহজ নয়। আমরা জ্ঞানের সেই জায়গায় কাজ করছি যাতে কৃষক তার এলাকার জীববৈচিত্র্য রক্ষায় নিজেরাই কাজ করে যেতে পারে এবং নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে সুস্থায়ী কৃষির মাধ্যমে।

তথ্যসূত্র

১. আবদুল্লাহ আল মুতী, পরিবেশ প্রযুক্তি ও নারী, মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা- বৃক্ষ ও পরিবেশ সংখ্যা, ভলিউম-৯, সংখ্যা-২৭, ১৯৯১
২. Aldo Leopold, "The Land Ethic" in Hugh Lafollette (ed.), Ethics in Practice, Blackwell, Oxford, 1997, pp. 634-643
৩. Paul Tailor, Respect for Nature, 1986
৪. দেবল দেব ও অন্যান্য, জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি ম্যানুয়াল, রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ, ২০১৭, পৃ. ৬৩
৫. বাংলাপিডিয়া, ভুক্তি - কৃষি, খন্ড ২, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩, পৃ. ৩৭৯-৩৯০
৬. রামকৃষ্ণ মুখার্জী, বাংলার ছ'টি গ্রাম (অনুবাদ), ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব লোকাল গভর্নমেন্ট, ১৯৯৭, পৃ. ৩৮
৭. পূর্বোক্ত, প, ৬৩-৬৬
৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬-৭৭
৯. পূর্বোক্ত, প. ১৫৯
১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬১
১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৩
১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৭
১৩. ভেলাম ভান সেন্ডেল (সম্পাদিত), দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় ফ্রান্সিস বুখানন (১৭৯৮) কুমিল্লা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রামে তার ভ্রমণ, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বেঙ্গল স্টাডিজ, ঢাকা ১৯৯৪, পৃ. ১৩
১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭-৪০
১৫. পিটার জে বার্টোসি, অস্পষ্ট গ্রাম : পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামীণ সামাজিক কাঠামো এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক সংকলন (Elusive villages: Social Structure and Community Organization in Rural East Pakistan); ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব লোকাল গভর্নমেন্ট, ১৯৯২, পৃ. ৪৮
১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭-৪৯
১৭. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, বাংলাদেশের গ্রাম, ডানা প্রকাশনী, ১৯৮৪, পৃ. ৪৮-৪৯
১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২
১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫-৫১
২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩
২১. জসিমউদ্দীন, সোজন বাদিয়ার ঘাট, পলাশ প্রকাশনী, চতুর্দশ সংস্করণ, ১৯৮৬
২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪-১৫
২৩. রনেশ দাশ গুপ্ত (সম্পাদিত), জীবনানন্দ দাশের কাব্য সম্ভারঃ খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি, আশ্বিন ১৩৯৮ (১৯৯১)
২৪. পূর্বোক্ত, নদীরা, পৃ. ৯৯
২৫. পূর্বোক্ত, পৃথিবী রয়েছে ব্যস্ত, পৃ. ১১৫
২৬. পূর্বোক্ত, আবার আসিব ফিরে, পৃ. ১১৭
২৭. পূর্বোক্ত, আকাশে সাতটি তারা, পৃ.১১২
২৮. পূর্বোক্ত, রূপসী বাংলা, পৃ. ১১২
২৯. আবদুল মান্নান সৈয়দ, (সংকলিত), শ্রেষ্ঠ নজরুল, অবসর, ঢাকা, ১৯৯৬,
৩০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতবিতান, রবীন্দ্র রচনাবলী, বিশ্বভারতী, কলকাতা, মাঘ ১৩৯২

৩১. সুশীলকুমার দে, বাংলা প্রবাদ, এ মুখার্জী এন্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৯২ (১৯৮৬), পৃ. ২৩৬-২৪২
৩২. বাংলাপিডিয়া, ভুক্তি - খনা, খন্ড ৩, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩, পৃ. ২১
৩৩. সুরাইয়া বেগম ও অন্যান্য, প্রান্তিয় জনগোষ্ঠীর জ্ঞানভিত্তিক কৃষি প্রতিবেশ : শিক্ষণ ও গণগবেষণা, অপ্রকাশিত সেমিনার পেপার, কীনোট পেপার, ন্যাশনাল সেমিনার, ২০১৮
৩৪. বিবিএস, খানা আয়-ব্যয় জরিপ, ২০১৬
৩৫. অনুপম পাল, কৃষি : ভাবনা ও দুর্ভাবনা, ভারতী বুক স্টল, কলকাতা,২০০৭, পৃ. ৬৭-৯৮
৩৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২
৩৭. Vandana Shiba, The Violence of the Green Revolution, Research Foundation for Science, Technology and Ecology, New Delhi, 2001
৩৮. অনুপম পাল, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৮১
৩৯. Sangram Sing Tomar, Organic foods: Production & Quality Assurance, Department of Agriculture, Bhupal, 2002, p. 125-138
৪০. Smith, A. H. EO Lingas and M. Rahman (2000). Contamination of drinking water by arsenic in Bangladesh: A public health emergency, Bulletin of World Health Organization 78(9): 1093-1103.
৪১. বারসিক, আমাদের কৃষি, আমাদের জীবন: কৃষির পরিবর্তনশীলতা ও মধুপুরের গারো আদিবাসীদের জীবন সংগ্রাম, ২০০৬, পৃ. ৪২
৪২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬
৪৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১
৪৪. আব্দুল বায়েস, মাহবুব হোসেন, গ্রামের মানুষ গ্রামীণ অর্থনীতি, জীবন জীবিকার পরিবর্তন পর্যালোচনা, রাইটার্স ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ও স্বরাজ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১২০
৪৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১
৪৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২২
৪৭. http://bforest.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bforest.portal.gov.bd/page/2df7f2df_fa89_453f_8058_7efa3bd806f1/Annual%20Report%202016-2017_Final.pdf)
৪৮. আলী আসগর, পরিবেশ - পরিকীর্ণ চেতনায়, মীজানুর রহমানের পত্রিকা, বৃক্ষ ও পরিবেশ সংখ্যা, পৃ. ৫৪২-৫৫২, ১৯৯১
৪৯. দেবল দেব ও অন্যান্য, জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি ম্যানুয়াল, রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ, ২০১৭, পৃ. ১১
৫০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২
৫১. https://www.facebook.com/unitednations/posts/10155493275340820 http://www.fao.org/zhc/detailevents/en/c/889172/?utm_source=facebook &utm medium= social+media&utm_campaign=fao+facebook
৫২. https://www.greenfacts.org/en/agriculture-iaastd/ https://en.wikipedia.org/wiki/ International_Assessment_of_Agricultural_Knowledg,_Science_and_Technology_for_Development
৫৩. রাশিদা আখতার খানম, নারীবাদ ও দার্শনিক মতবাদ, সনিকে, ২০০০, পৃ. ৫৬
৫৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭
৫৫. সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান (সম্পাদিত), জেন্ডার বিশ্বকোষ, দ্বিতীয় খন্ড, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৩৯

৫৬. সুরাইয়া বেগম ও অন্যান্য, বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, রিইব, ঢাকা, ২০১১
৫৭. সৈয়দ শফিউল্লা, রাসায়নিক কীটনাশক ও পরিবেশ ভারসাম্য, 'বৃক্ষ সংখ্যা', মীজানুর রহমানের পত্রিকা, বৃক্ষ ও পরিবেশ সংখ্যা, ১৯৯১, পৃ. ৫৮৯
৫৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮৯
৫৯. আনোয়ারুল করিম, পল্লী উন্নয়নে রবীন্দ্রনাথ, অ আ প্রকাশন, ২০০৪, পৃ. ১৩-১৪
৬০. রবীন্দ্র রচনাবলী, বিশ্বভারতী, কলকাতা, মাঘ ১৩৯২,
৬১. রবীন্দ্র রচনাবলী, ২য় খন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, মাঘ ১৩৯২
৬২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাশিয়ার চিঠি, ড. অমিতাভ চৌধুরী, জমিদার রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী, ১৯৭৬, পৃ. ২১
৬৩. রবীন্দ্র রচনাবলী, পল্লী প্রকৃতি, পৃ. ২
৬৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩
৬৫. Paulo freire : Cultural Action for Freedom Penguin, 1972
৬৬. Suraiya Begum, *Gonogobeshana*, in David Coghlan and Mary Brydon Miller (ed.) Sage Encyclopedia of Action Research, Vol. 1, Sage p. 385
৬৭. Md. Anisur Rahman, Peoples Self Development : Perspective on Participatory Action Research – A Journey through Experience, UPL, Dhaka, 1994, p.75
৬৮. Who will feed us? The Peasant food web vs. The Industrial Food Chain, ETC Group, 2017
৬৯. পূর্বোক্ত, ২০১৭
৭০. সৈয়দ মুহাম্মদ হুমায়ুন কবির, পরিবেশ ও মৃত্যু ব্যবসা, বৃক্ষ সংখ্যা, পৃ. ৬১৯-৬২২

Research Initiatives, Bangladesh (RIB)

Research Initiatives, Bangladesh (RIB) was founded to promote knowledge on poverty alleviation that is relevant, useful, innovative, participatory and action oriented, with a special focus on marginalized and socially excluded communities. RIB views poverty as a multidimensional process and recognizes that the needs of poverty groups go beyond simple income generation, food and shelter, to areas such as equality, dignity, justice, human rights and good governance. RIB supports marginalized and minority groups who are unable to access basic services due to social discrimination and conduct people's research (*Gonogobeshona*) on the development schemes that affects them most, in order to develop ownership and generate community mobilization. For more information please visit: www.rib-bangladesh.org

Rosa Luxemburg Stiftung (RLS)

Rosa Luxemburg Stiftung (RLS) is a political foundation from Germany that works within the tradition of workers' and women's struggles. Bearing the name of Democratic Socialist Rosa Luxemburg (1871-1919), the foundation serves as a forum for debate and critical thinking about political alternatives, as well as a research centre for progressive social development. RLS promotes the discourse among activists, scientists and intellectuals from South Asia and Germany as well as from other regions of the world. A special focus lies on creating networks among countries of the Global South. The foundation also provides space for critical discourse and publishes educational material.
For more information please visit : www.rosalux.in